আমি এক হয়ে যাই তোমার প্রেমের সঙ্গে, হয়ে উঠি শুধু তোমার অফুরন্ত প্রেম। সকল বস্তুর মধ্যে আমি প্রবেশ করি, প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যে আমি বাস করি, সেখানে প্রজ্বলিত করি সেই আগুন যা এনে দেয় শুদ্ধি, এনে দেয় রূপান্তর, যার নির্বাণ নেই কখন, তোমার পরাতৃপ্তির বাহকশিখা, সকল সিদ্ধির সিদ্ধিদাতা।

শ্রীমা

‘রূপান্তর’ প্রকাশে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম সহ যে সমস্ত বন্ধু, শুভানুধ্যায়ী,গ্রাহক, পাঠক ও গ্রন্থ পরিবেশক যে সহযোগিতা ও আন্তরিকতা প্রকাশ করছেন — তাদের প্রতি রইল আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও ভালবাসা ।

❑ গ্রাহক মূল্য ❑❑ ১৫০ টাকা (এক বছরের জন্য)
❑ মানি অর্ডার, চেক ও ড্রাফটে গ্রহণ করা হয়
❑ পত্রিকা প্রকাশের দিন ❑❑ ২১ ফেব্রুয়ারী, ২৪ এপ্রিল,
১৫ অগাস্ট ও ২৪ নভেম্বর
❑ বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়
❑ ডাক যোগাযোগ ❑❑ রূপান্তর
রত্নাকর সেনগুপ্ত
৩৫বি, অশোক রো (ইষ্ট),
কলকাতা - ৭০০ ০৮৪
❑ ই মেল ❑❑ roopantar@hotmail.com
❑ মোবাইল ❑❑ ৯৮৩১৩২২৪৩০
❑❑ ০৭৮৪৫৫৪৬৩১১

❑ © শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম ট্রাস্ট,
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী
❑ সম্পাদনা ও প্রকাশনা ❑❑ রত্নাকর সেনগুপ্ত
❑ কো-অর্ডিনেটর ❑❑ জয়দীপ চক্রবর্তী
❑ অক্ষর বিন্যাস ❑❑ বাসব চট্টোপাধ্যায়
শিলালিপি, ১৬এ, টেমার লেন,
কলকাতা - ৭০০ ০০৯
❑ মুদ্রণ ❑❑ প্রিন্ট ও প্রসেস, ১৫/৫/১, কে. বি. সরণী,
কলকাতা - ৭০০ ০৮০

❑ ৫০ টাকা

মায়ের প্রার্থনা

এপ্রিল ২৮, ১৯১৪

জগতের অধীশ্বর তুমি, তোমার বিধান ক্রমেই সুস্পষ্ট ফুটে উঠছে আমাদের দৃষ্টিপথে। আমি ভেবেছিলাম, না, তুমি বরং আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলে, — প্যারিস হতে আমার যাত্রার পূর্বে — যা ঘটেছে তার চেয়ে ভাল আর কিছু ঘটতে পারে না, কারণ, জগতের মধ্যে তোমার কাজ তার চেয়ে ভাল আর কিছু দিয়ে হতে পারে না।

নিবিড় আনন্দের মধ্যে তোমার শক্তির সঙ্গে আমার সংযোগ হয়েছে — সে-শক্তি অন্ধকার আর প্রমাদকে বশীভূত করে, অপরূপ এক চিরন্তন ঊষার মত উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, কপট শক্তি আর তার আপাত-সফলতার কর্দমরাশির ঊর্ধ্বে। সবকিছু এখন আলোর মধ্যে এনে ধরা হয়েছে; আন্তরিকতার পূর্ণ জ্যোতির দিকে আমরা এক পা এগিয়ে গিয়েছি। এই পূর্ণজ্যোতি হবে পৃথিবীর উপর তোমার রাজত্বের প্রথম সোপান।

ভগবান, অচিন্তনীয় জ্যোতি, সকল অজ্ঞান তুমি জয় কর, জয় কর সকল অহংকার, আমাদের হৃদয় উজ্জ্বল কর, মন আলোকিত কর। জ্ঞান তুমি, প্রেম তুমি, তুমি পরম সত্তা। আমি যেন তোমার একত্বের চেতনায় নিরন্তর বাস করি, তোমার ইচ্ছা অনুসারে যেন নিরন্তর চলি।

শ্রদ্ধাপূর্ণ নীরব ভক্তিভরে তোমাকে প্রণাম করি বিশ্বের একচ্ছত্র অধীশ্বররূপে।

উৎস : *Prières et Méditations* গ্রন্থের অনুবাদ :
ধ্যান ও প্রার্থনা, **পৃ :৭৪-৭৫, অনুবাদ: নলিনীকান্ত গুপ্ত**

রূপান্তর বর্ষ : ১৮ সংখ্যা : ২ ২৪ এপ্রিল ২০১৫

❑ সূচী ❑

		পৃষ্ঠা
❑ সম্পাদকীয়-এর পরিবর্তে: কি করে মায়ের সত্যকার শিশু হয়ে ওঠা যায়	❑❑ নলিনীকান্ত গুপ্ত	১
❑ শ্রীঅরবিন্দ, যাঁকে আমি জানি ...	❑❑ শ্রীমা	৩
❑ ভগবান তোমার সঙ্গে রয়েছেন	❑❑ শ্রীমা	৮
❑ সাধনা ও জীবন	❑❑ শ্রীমা	১১
❑ ধূমপান, মদ ও মাদকদ্রব্য	❑❑ শ্রীমা	১৪
❑ এই নীরব নিস্তরঙ্গ শান্ত মনের অবস্থাকে ধরে রাখতে জানা চাই	❑❑ শ্রীমা	১৬
❑ মায়ের কাছে সমর্পণ	❑❑ শ্রীঅরবিন্দ	১৯
❑ প্রাণের রূপান্তর	❑❑ শ্রীঅরবিন্দ	২২
❑ আধ্যাত্মিক ও অতিমানস রূপান্তর	❑❑ শ্রীঅরবিন্দ	২৬
❑ চৈত্যপুরুষের সবচেয়ে অন্তরঙ্গ স্বভাব হল পবিত্র প্রেম	❑❑ শ্রীঅরবিন্দ	২৯
❑ দুজনের চেতনার ঐক্য	❑❑ শ্রীঅরবিন্দ	৩১
❑ যোগপথের বাধাবিঘ্ন	❑❑ শ্রীঅরবিন্দ	৩৩

২৪ এপ্রিল ১৯২০

আমার পণ্ডিচেরী প্রত্যাবর্তনের বার্ষিকী হ'ল বিরুদ্ধ শক্তিদের উপর নিশ্চিত বিজয়লাভের মূর্ত প্রতীক।

২৪ এপ্রিল ১৯৩৭ শ্রীমা

উৎস: Cent. Edi. Vol. No. 13, p.63, অনুবাদ: দেবযানী সেনগুপ্ত

সম্পাদকীয়-এর পরিবর্তে :

কি করে..., মায়ের সত্যকার শিশু হয়ে-ওঠা যায়? মাকে ভালবেসে, ভালবাসার মধ্য দিয়ে মায়ের চেতনার সঙ্গে এক হয়ে। ...

নলিনীকান্ত গুপ্ত

আজ এখানে তোমরা মা ও শ্রীঅরবিন্দের অনেক বাণী রেখেছ — অনেক সুন্দর সুন্দর কথা, অনেক ভাল ভাল কথা। কিন্তু আমি বলি — এসব কথা প্রাণহীন, মৃতবৎ। হাঁ, নিছক লেখাই যদি থাকে তারা, তবে তারা মৃতই — তাকে জীবন্ত করে তুলতে প্রাণ দিতে পার তোমরা, তোমাদের জীবন দিয়ে, তোমাদের চেতনা দিয়ে — যা-কিছু লেখা রয়েছে, বলা হয়েছে তাকে নিজেদের জীবনে মূর্ত করে, তাই হয়ে উঠে। এসব বাণী তখনই সত্য হয়ে, জাগ্রত জীবন্ত সত্য হয়ে উঠবে।

হয়ে উঠতে হবে — এবং এই হয়ে-ওঠা এ শুধু তোমরা ছোটরাই পারবে। যারা বড়, বয়োবৃদ্ধ, তারা যা হতে পেরেছে, হয়ে উঠেছে, তাদের হয়ে-ওঠার পালা শেষ হয়ে গেছে, যা হবার তারা হয়ে গেছে। তাই সেদিন বড়দের ক্লাশে বড়দের কাছে বলেছিলাম, — মায়ের শিশু হতে হবে। শিশু হওয়া অর্থ নূতন হওয়া। শিশুরাই শুধু পারে হয়ে উঠতে কারণ তাদের স্বভাবের ধারাই হল হয়ে-ওঠা। ছোটদের নবীন চেতনায় আছে এই হয়ে-ওঠার আস্পৃহা — সহজ প্রবণতা। যা কিছু ভাল, সুন্দর তা শুধু পড়লে, জানলেই হবে না, তা জীবনে গ্রহণ করতে হবে, চেতনা দিয়ে তাই হয়ে উঠতে হবে, মনে প্রাণে দেহে তাকে মূর্ত করে ধরতে হবে।

কি করে এই মায়ের শিশু, মায়ের সত্যকার শিশু হয়ে-ওঠা যায়? মাকে ভালবেসে, ভালবাসার মধ্য দিয়ে মায়ের চেতনার সঙ্গে এক হয়ে। তোমরা প্রায় সকলেই মাকে দেখেছ, মায়ের স্পর্শ পেয়েছ, অনেকে আরও বেশি পেয়েছ, আরও নিবিড় করে, আরও ঘনিষ্ঠভাবে। আমি তো আগেই বলেছি মা যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা সম্পূর্ণ সত্য ও জীবন্ত — শুধু তা রয়েছে একটা পর্দার আড়ালে এবং সেখানে হতে ক্রমেই প্রকট হতে, জড়স্তরে রূপ নিতে চেষ্টা করছে। তা সম্পূর্ণ, শুধু জড়-রূপায়ণটুকু বাকি। এবং মা করে চলেছেন যাতে রূপায়ণ সত্বর ও সিদ্ধ হয়। তোমাদের দিক হতে শুধু প্রয়োজন — কারণ তোমরা ছোটরাই তাকে গ্রহণ করবে — তোমাদের মধ্য দিয়েই তা রূপায়িত হবে — তোমাদের দিক থেকে সেজন্য প্রয়োজন শুধু চাওয়া — নূতন সৃষ্টিকে গ্রহণ করতে; তাতে অংশগ্রহণ করতে চাওয়া। চাওয়া, সত্য সত্য চাওয়া — আন্তরিকভাবে চাওয়া।

এই জন্যই তোমরা এখানে এসেছ ও আছ — এর জন্যই তোমরা এখানে বড়

হচ্ছ। আর যা-কিছু — পড়াশুনা, খেলাধূলা — সব করবে, যেমন সব কর — তাদেরও স্থান আছে কিন্তু তা গৌণ। আসল উদ্দেশ্য নূতন চেতনা গ্রহণ করা, মায়ের সন্তান হয়ে ওঠা। আর তা যদি সত্যই চাও, নূতন সৃষ্টি নূতন চেতনা আপনিই তোমাদের মধ্যে নিজেকে ঢেলে দেবে, যা দরকার করে নেবে এবং সেই কাজই সে করে চলেছে। মায়ের চেতনা তোমাদের ঘিরে রয়েছে। সেই চেতনা ও শক্তির সংস্পর্শে আছ কিনা, তার কাছে নিজেকে খুলে রাখতে পারছ কিনা কি করে বুঝবে? তার সুনিশ্চিত লক্ষণ আছে — সে চেতনার স্পর্শ পেলে নিজের ভিতরে অনুভব করবে একটা সুখ — একটা প্রশান্ত আনন্দবোধ যার বাহ্য কোন কারণ নেই — বাহ্য কোন কিছুর উপর তা নির্ভর করে না — এ যেন একটা আলো ভিতর হতে জ্বলে উঠেছে — ভিতর হতে বাইরে ছড়িয়ে পড়ছে ক্রমে। আর অনুভব করবে একটা মুক্তির স্বাদ — একটা অনাবিল স্বাধীনতা — কোন বন্ধন নেই, কোন আড়াল নেই — যতদূর খুশি নিজেকে মেলে দিতে পার — সব কিছু হতে মুক্ত তুমি, একটা বিশাল প্রসারের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছ — উপরে নীচে আশে-পাশে কোথাও কোন বাধা ও বন্ধন নেই।

এ-বস্তু— এই আনন্দ ও স্বাধীনতা তোমাদের ঘিরে রয়েছে — সমস্ত আবহাওয়ায় ছড়িয়ে আছে তা।

এই যে আনন্দ ও মুক্তির কথা বললাম, যা এখানকার আবহাওয়ার বৈশিষ্ট্য, তা কেবল বালসুলভ চাপল্য বা চটুলতা নয়, এ জিনিস তরুণদের মধ্যে সর্বত্রই রয়েছে। কিন্তু এখানে এই দুটি গুণ লাভ করেছে যে একটা বিশিষ্ট ধর্ম তার হেতু তাদের পিছনে রয়েছে এখানকার আবহাওয়ায় মায়ের জীবন্ত চেতনা — মায়ের শারীরিক চেতনা বলতে পারি। এই জিনিসটিই মা তোমাদের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং বাইরেও এ জিনিস দিয়ে তোমাদের ঘিরে রেখেছেন। এই পরিবেশ, এই আবহাওয়া পৃথিবীতে আর কোথাও মিলবে না। তোমরা তা অনুভব কর না প্রায়ই, কারণ অন্য কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাক — জলের মধ্যে মাছ কি জানে যে জল তাকে ঘিরে আছে? এও তেমনি। এত সহজ ও স্বাভাবিক তা যে তোমরা তার সম্বন্ধে সচেতন নও।

এর বেশি যদি কিছু করতে চাও, সচেতনভাবে মায়ের কাজে সহযোগী হতে চাও, যদি কিছু কষ্ট করবার, নূতনের জন্য কিছু তপস্যার মত করবার ইচ্ছা হয় তবে চেষ্টা করতে পার। আরও একবার বলছি তোমাদের — মা বলে গিয়েছেন কটি নিয়ম — এই নিয়মানুবর্তিতা চেষ্টা ও অভ্যাস করতে পার :

এমন কোন কাজ করবে না যা মায়ের সামনে করতে সঙ্কোচ হয়,
এমন কিছু বলবে না যা মায়ের সামনে বলতে লজ্জা হয়,
এমন কিছু ভাববে না যা মায়ের সামনে ভাবতে কুণ্ঠা হয়,
বা এমন কিছু অনুভব করবে না যা মায়ের সামনে অনুভব করতে দ্বিধা হয়।

এই হল মায়ের দেওয়া সোনার নিয়ম — চেষ্টা করে দেখ — ফলাফল নিজেরাই দেখতে পাবে — সহজ নয়, কিন্তু ভারী চিত্তাকর্ষক।

উৎস: *রচনাবলী : নলিনীকান্ত গুপ্ত*, নবম খণ্ড

শ্রীঅরবিন্দ, যাঁকে আমি জানি এবং যাঁর সঙ্গে আমি পার্থিব জীবনে ত্রিশটি বৎসর অতিবাহিত করেছি, যিনি আমাকে ছেড়ে যাননি, একটি মুহূর্তের জন্যও নয় — কেননা তিনি এখনও আমার সঙ্গে রয়েছেন, অহর্নিশি, তিনি আমারই মস্তিষ্কের মধ্য দিয়ে চিন্তা করছেন, আমারই কলমের মাধ্যমে লিখছেন, আমার মুখ দিয়ে তিনি কথা বলছেন এবং আমার সাংগঠনিক শক্তির মাধ্যমে কর্ম করে চলেছেন।

শ্রীমা

কর্মধারা এবং শিক্ষা

যদি পরমপ্রভুর এই ইচ্ছা হয় যে যারা আমারই উপর নির্ভর করছে আমার প্রতি তাদের কোন বিশ্বাস থাকবে না, তাহলে আমার কোন কিছুই বলবার নেই। একমাত্র আমার নিজের আন্তরিকতার পরিপূর্ণতার প্রতিই আমি দায়বদ্ধ থাকব।

১৪ ডিসেম্বর ১৯৩২

*

তোমার ইচ্ছার সঙ্গে আমার ইচ্ছাকে মিলিয়ে দেবার কি কোন উপায় নেই? সম্ভবত তোমার কোন বিশেষ ইচ্ছা নেই, কেননা তুমি তো কোন কিছুই চাও না।

আমি কি চাই অথবা বরং বলতে পার ভগবানের ইচ্ছা কি সে বিষয়ে আমি খুব ভালভাবেই জানি। আর কালের স্রোতে একদিন এই দিব্যইচ্ছাই বিজয় লাভ করবে।

১১ মে ১৯৩৪

*

আমার আশা এবং আমার বিশ্বাস এই যে তোমার কাজ মানবজাতির উপর নির্ভর করে না।

না, আমার কাজ মানবজাতির উপর একেবারেই নির্ভর করে না। সম্ভাব্য সকলরকম বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও যা কিছু করবার রয়েছে তা সম্পন্ন করা হবেই।

*

একমাত্র একটি বিষয় সম্বন্ধে আমি পূর্ণভাবে নিশ্চিত, এবং তা হল *আমি কে*, শ্রীঅরবিন্দও তা জানতেন এবং তিনি তা ঘোষণা করেছিলেন। এমন কি সমগ্র মানবজাতির সন্দেহও এই বিষয়ের কিছুমাত্র পরিবর্তন করতে সক্ষম হবে না।

কিন্তু আরেকটি বিষয় রয়েছে যা অতটা সুনিশ্চিত নয় — তা হল আমার সত্তার পৃথিবীতে দেহধারণ করা এবং যে কাজ আমি করে চলেছি তার প্রয়োজনীয়তা। কোন রকম ব্যক্তিগত অনুপ্রেরণার দরুন যে এ কাজ আমি করছি তা নয়। শ্রীঅরবিন্দ আমাকে এ কাজ করতে বলেছিলেন। আর সেই কারণে পরমপ্রভুর আদেশের প্রতি আনুগত্য-বশত একটি পবিত্র কর্মরূপে আমি এই কাজ করছি।

এই কর্মের মধ্য দিয়ে পৃথিবী কতদূর উপকৃত হল, কালের স্রোত তা একদিন উদ্ঘাটিত করবে। ২৪ মে ১৯৫১

*

একটি চিঠির লক্ষ্যবস্তু সম্পর্কে উত্তর

যদি পরমচৈতন্য নিজেকে এই দেহটির মধ্যে মূর্ত এবং প্রকাশিত করে থাকেন, তাহলে জগতের সমস্তরকম অস্বীকারও সেই হওয়াকে নিবৃত্ত করতে পারে না।

আর যদি তা না হতো, তাহলে যাদের বিশ্বাস রয়েছে এবং যারা এই বিশ্বাসের সাহায্যে আমার মাধ্যমে পরম চৈতন্যের সাথে যুক্ত হতে পারে, একমাত্র তাদের কাছেই আমার পার্থিব জীবনটি আকর্ষণীয় হয়ে উঠতো।[১]

একমাত্র তাদের কাছেই প্রশ্নটির গুরুত্ব রয়েছে, আর অন্যদের এ বিষয়ে জানবার কোন প্রয়োজন নেই। কেননা সেই ধরনের বিশ্বাস আন্তরিক এবং কার্যকরী হওয়ার দরুন, কোনরকম প্রচারের বিষয়বস্তু হয়ে উঠতে পারে না, সেই প্রচার বিশ্বাসের পক্ষে অথবা বিপক্ষে যাই হোক না কেন। অবশ্যই এক মুক্ত এবং স্বতঃস্ফূর্ত অবস্থার থেকে এই ধরনের বিশ্বাসের জন্ম হয়ে থাকে। একে যেমন কোনরকম বাধ্যবাধকতার দ্বারা অর্জন করা যায়না তেমনি কোন অস্বীকারের মধ্য দিয়ে ধ্বংসও করা যায় না।

কেউ যখন যেকোন রকম প্রত্যয় অথবা বিশ্বাসের বিরুদ্ধে তীব্রভাবে সংগ্রাম করবার প্রয়োজনীয়তাকে অনুভব করে, তখন তার সেই বিশেষ অবস্থা এটিই প্রমাণিত করে যে তার সত্তার মধ্যস্থিত কোন একটি অংশ, সে অংশটি যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন; অংশটি এই বিশ্বাসের স্পর্শ লাভ করেছে। আবার তার সত্তার আরেকটি অংশ, যে অংশটি সাধারণত বেশী গুরুত্বপূর্ণ এবং বহির্মুখী, সেই অংশটি যেকোন রকম বিশ্বাসকে গ্রহণ করবার ব্যাপারটিকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করে। 'বিশ্বাস' ব্যাপারটি তার কাছে অনেক বেশী বিপজ্জনক বলে মনে হয়, এর কারণ হ'ল এই যে 'বিশ্বাসের' প্রতি সে অতিরিক্ত অনুভূতিপ্রবণ। আর তার নিজের দৃঢ় প্রত্যয় উৎপাদন করবার প্রয়োজনীয়তা

১ অন্য আরেকটি লেখায় ''প্রয়োজনীয়'' শব্দটি রয়েছে।

থেকেই আসে তার এই বিশ্বাসকে জোর করে অস্বীকার করবার প্রবণতা।

অধ্যাত্মবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, আমি জানি আমি কি। কিন্তু এই জ্ঞান যা বিরাজ করছে, তার মূল্য রয়েছে কেবল মাত্র আমার নিষ্ঠার মধ্যে। আর এই নিষ্ঠার বিচার করতে পারেন একমাত্র সেই পরমপুরুষ। ৭ নভেম্বর ১৯৫১

*

আমি জানি যে আমি খুব বেশী কিছু করতে পারি না — বিস্ময়কর ব্যাপার এবং অলৌকিক ঘটনাবলীর প্রতি মানুষের আসক্তিকে আমি পূর্ণ করতে পারি না। এক সময় ছিল যখন আমি সেসব পারতাম এবং করতামও। কিন্তু এইসব করবার জন্য অবশ্যই প্রাণময় চেতনায় অবস্থান করতে হয় এবং প্রাণ জগতের শক্তিগুলিকে ব্যবহার করতে হয়, যা করাটা বিশেষ সমীচীন নয়। ২৩ জানুয়ারী ১৯৫২

*

আমার সম্পর্কে বলা হবে : ''তিনি ছিলেন উচ্চাকাঙ্খী, পৃথিবীকে তিনি রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন''। কিন্তু পৃথিবী একটি খুবই সুদীর্ঘ এবং ধীরগতিসম্পন্ন পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোন ভাবে রূপান্তরিত হতে চায় না। এই পদ্ধতিটি এতটাই মন্থর যে পুরুষানুক্রমে কোনরকম পরিবর্তনকে উপলব্ধি করা যায় না।

আমি দেখেছি যে প্রকৃতি বিলম্ব করে এবং সময় অপচয় করে। কিন্তু সে লক্ষ্য করে যে আমিও বড্ড বেশী ব্যস্ততার মধ্যে রয়েছি এবং আমিও বড়ই ঝঞ্ঝাটে পূর্ণ। আর আমার দাবি মিটিয়ে নেবার জন্য আমিও বাধ্য করতে পারি।

আমার যা কিছু বলবার আছে সে সব আমাকে লিখতে দাও; যা কিছু সম্পন্ন করা হবে সে সব কিছু সম্বন্ধে আমাকে ভবিষ্যদ্বাণী করতে দাও, আর তারপর, আমি যে এই কর্মটি যথাযথভাবে সম্পন্ন করছি তা যদি একজনও দেখতে না পায়, তাহলে আমি কর্মটি থেকে অবসর নেব এবং অন্যদের তা করবার জন্য ছেড়ে দেব।

৩১ মার্চ ১৯৫৩

*

আমি অস্বীকার করছি না যে তুমি শ্রীঅরবিন্দের কোন অংশের সঙ্গে একটি সংযোগ লাভ করেছ; সেই জিনিস যা তোমাকে আকৃষ্ট করেছে এবং যার মধ্যে তুমি কাজ করে চলেছ। এই বস্তু তোমাকে আমেরিকায় এবং অন্য যে কোন স্থানে তোমার কাজে অনুপ্রেরণা দেবার জন্য এবং সাহায্য করবার জন্য অবশ্যই তোমার সঙ্গে অবস্থান করবে। কিন্তু এটি হল একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র, শ্রীঅরবিন্দের একটি খুবই, খুবই ক্ষুদ্রতম অংশ হল এটি। শ্রীঅরবিন্দ, যাঁকে আমি জানি এবং যাঁর সঙ্গে আমি পার্থিব জীবনে ত্রিশটি বৎসর অতিবাহিত করেছি, যিনি আমাকে ছেড়ে যাননি, একটি মুহূর্তের জন্যও নয় — কেননা তিনি এখনও আমার সঙ্গে রয়েছেন, অহর্নিশি, তিনি আমারই মস্তিষ্কের মধ্য দিয়ে চিন্তা করছেন, আমারই কলমের মাধ্যমে লিখছেন, আমার মুখ

দিয়ে তিনি কথা বলছেন এবং আমার সাংগঠনিক শক্তির মাধ্যমে কর্ম করে চলেছেন।

৫ মে ১৯৫৩

*

অবতারত্বের সম্ভাবনার প্রতি বিশ্বাস থাকা বা না থাকা, এই অনাবৃত বিষয়টির ক্ষেত্রে কোন তফাৎই গড়ে তুলতে পারে না। ভগবান যদি একটি মানব দেহের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করতে চান, আমি বুঝতে পারি না কিভাবে কোন মানব চিন্তা, তার স্বীকৃতি কিংবা অস্বীকৃতি পরমপুরুষের সিদ্ধান্তকে বিন্দুমাত্র প্রভাবিত করতে পারে। আর যদি তিনি একটি দেহের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন, মানুষের অস্বীকৃতি সেই সত্যটির সত্য হয়ে ওঠাকে বাধা দিতে পারে না। কাজেই উত্তেজিত হয়ে উঠবার কি-ই বা রয়েছে। একমাত্র পরিপূর্ণ অচঞ্চলতা ও নীরবতার মধ্যে, সমস্ত রকম কুসংস্কার এবং পক্ষপাতিত্ব থেকে মুক্ত হতে পারলে, চেতনা সেই সত্যকে উপলব্ধি করতে পারে।

২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৫৩

*

আমার অবতারত্বের বিষয়ে কি ভাবে জনসাধারণের মতামতের কোনরকম গুরুত্ব থাকতে পারে?

যদি আমি তা না হই (একজন অবতার), তাহলে সহস্রাধিক ভক্তের বিশ্বাসও আমাকে তা করতে পারে না। আর অন্যদিকে, যদি আমি একজন অবতার হই, সমগ্র জগতের অস্বীকারও আমাকে তা হওয়ার ক্ষেত্রে বাধা দিতে পারে না।

২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৫৩

*

ন্যায়বিচার অপরিহার্য হয়ে থাকে।

এখানে একটি চেতনা কাজ করে চলেছে। যখন কেউ একজন এই দিব্য চেতনার বিরোধী হয়ে ওঠে, প্রতিটি বার এমনটি হওয়ার পর, সে তার নিজের চেতনার কিছু অংশকে হারিয়ে ফেলে। প্রত্যেকবার এই দিব্য চেতনার বিরোধী কিছু কাজ করবার পর সে তার চেতনার নিম্নস্তরে নেমে যায়। আবার এই দিব্য চেতনার অনুকূলে কাজ করলে প্রত্যেকবার তার চেতনার বৃদ্ধি ঘটে।

জগৎ সেই একইভাবে চলেছে। তুমি কিংবা আমি যখন এর পরিবর্তন আনবার জন্য কিছুমাত্র করতে পারছি না, তখন আমরা কেবলমাত্র ব্রহ্মের মতই অচঞ্চল, নীরব সাক্ষী হয়ে থাকতে পারি। জগতের মত এখানেও সেই একই ব্যাপার। কতকিছুই ঘটে চলেছে : প্রত্যেকে তার নিজের শ্রেষ্ঠত্বকে প্রমাণ করবার জন্য চেষ্টা করছে; সব রকমের রাজনীতি, সব রকমের প্রচার রয়েছে। আমি শুধুমাত্র ব্রহ্মের মতই সাক্ষী হয়ে রয়েছি; আমি এসবের পক্ষে বা বিপক্ষে কোনটাই নই, আমি এ সমস্ত কিছুকে সমর্থনও করছি না কিংবা নিন্দাও করছি না। ২৬ এপ্রিল ১৯৫৫

*

আমার কাছে মানব জীবনের সব কিছুই হল মিশ্রিত, কোন কিছুই পুরোপুরি ভাল কিংবা পুরোটাই খারাপ নয়। আমি আমার বিশেষ এবং পূর্ণ সমর্থনকে এই ভাবের প্রতি কিংবা ঐ ভাবনার উদ্দেশ্যে, এই কারণের জন্য অথবা অন্য আরেকটি কারণের জন্য প্রদান করতে পারি না। কর্মের ক্ষেত্রে, আমার কাছে একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ হল, শ্রীঅরবিন্দের কাজ, স্বভাবতই যা কিছু এই কর্মকে সাহায্য করছে সে সব কিছুর প্রতিই আমার সচেতন সমর্থন রয়েছে এবং সেই সমর্থন হল সাহায্যের আনুপাতিক। সেই কর্মটি ঠিক যেমনভাবে করা উচিত তেমনভাবে করে যাবার জন্য আমার প্রয়োজন সকলরকম সহযোগিতা এবং সবরকম সাহায্য। সেইসব সহযোগিতার মধ্য থেকে আমি কেবলমাত্র একটিকে কিংবা অন্যটিকে গ্রহণ করতে পারি না এবং বাদবাকীদের প্রত্যাখ্যানও করতে পারি না। আমি কোন একটি পক্ষ কিংবা অন্য আরেকটি পক্ষের অনুগামী হতে পারি না। আমি একমাত্র ভগবানের অঙ্গীভূত এবং সমস্তরকম সম্প্রদায় ও পক্ষ নির্বিশেষে ভগবানের জয়ের জন্যই পৃথিবীর বুকে আমার কর্ম এবং ভবিষ্যতেও সর্বদা তাই হবে।

উৎস: *Words of the Mother*, Cent. Edi. Vol. No. 13, PP. 47-51,
অনুবাদ: দেবযানী সেনগুপ্ত

(শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে শ্রীমায়ের প্রথম সাক্ষাতের পরবর্তী দিনে শ্রীমা তাঁর আধ্যাত্মিক দিনলিপিতে এই প্রার্থনাটি লিপিবদ্ধ করেছিলেন।)

... শত শত জীব যদি গাঢ়তম অজ্ঞানের মধ্যে নিমজ্জিত রয়ে থাকে — কিছু এসে যায় না তাতে। কাল যাঁকে আমরা দেখেছি তিনি পৃথিবীতে আছেন। তাঁর উপস্থিতিই যথেষ্ট প্রমাণ যে একদিন আসবে যখন অন্ধকার আলোকে রূপান্তরিত হবে, যখন তোমার রাজত্ব সত্যসত্যই পৃথিবীর উপর স্থাপিত হবে।

হে ভগবান, এই অত্যাশ্চর্যের দিব্যস্রষ্টা, আনন্দে কৃতজ্ঞতায় হৃদয় আমার পরিপ্লুত হয়ে যায় যখন এ চিন্তা আমি করি — আশা আমার অসীম হয়ে ওঠে।

ভগবান, আমার আরাধনা সকল বাক্যের অতীত, পূজা আমার নির্বাক।

মার্চ ৩০, ১৯১৪ শ্রীমা

উৎস: *Prières et Méditations* গ্রন্থের অনুবাদ: *ধ্যান ও প্রার্থনা*, পৃ:৬৪-৬৫,
অনুবাদ: নলিনীকান্ত গুপ্ত

ভগবান তোমার সঙ্গে রয়েছেন

শ্রীমা

(পূর্বসংখ্যা ২১ ফেব্রুয়ারী ২০১৫-এর পর)

সকল অপূর্ণতার মধ্যেও রয়েছে ভগবানের পরম মনোনিবেশের অপরিবর্তনীয় শান্তি এবং ভগবানের চিরন্তন অসীমের প্রশান্ত রূপ। ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৫৪

*

ভগবানের আলোকে আমরা দেখব, ভগবানের জ্ঞানে আমরা জানব, ভগবানের ইচ্ছাশক্তিতে আমরা উপলব্ধি করব। ২ অক্টোবর ১৯৫৪

*

ভগবানকে ব্যতীত সবই মিথ্যা ও মরীচিকা, সবই শোকপূর্ণ অন্ধকার। ভগবানে রয়েছে জীবন, আলোক ও আনন্দ। ভগবানে রয়েছে পরম শান্তি।২ অক্টোবর ১৯৫৪

*

আমাদের সমস্ত শক্তি রয়েছে ভগবানে। তাঁর সহায়ে আমরা সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করতে পারি। ৪ অক্টোবর ১৯৫৪

*

রাতের স্তব্ধতায় ভগবানের কণ্ঠস্বর সুরেলা স্তুতিরূপে শোনা যায়।
৭ অক্টোবর ১৯৫৪

*

ভগবানের বিজয় এত সম্পূর্ণ যে তাঁর বিরুদ্ধের প্রতিটি বাধা, প্রতিটি প্রতিকূল ইচ্ছা, প্রতিটি বিদ্বেষ আরও বৃহত্তর এবং আরও সম্পূর্ণ বিজয়ের প্রতিশ্রুতি বহন করে। ৯ অক্টোবর ১৯৫৪

*

তাঁর আলোকের সম্পূর্ণতার জন্য আমরা ভগবানকে আবাহন করি যাতে আমাদের মধ্যে তাঁকে প্রকাশ করার ক্ষমতা জাগরিত হয়। ১০ নভেম্বর ১৯৫৪

*

ভগবানেব বাণী সান্ত্বনা দেয়, আশীর্বাদ করে, প্রশমিত করে ও আলোক প্রদান করে এবং যে আচ্ছাদন আমাদের কাছ থেকে অনন্ত জ্ঞানকে আবরিত করেছে তার একটি পর্দা ভগবানের মহানুভব হস্তকে সরিয়ে দেয়। ১৮ নভেম্বর ১৯৫৪

*

ভগবানের মনোনিবেশের ঐশ্বর্য : কত শান্ত, উদার ও পবিত্র।
১৯ নভেম্বর ১৯৫৪

*

ভগবানের মধ্যে একটি সম্পূর্ণ নূতন জীবন যাপন করতে হবে যে জীবন একমাত্র ভগবানের দ্বারা প্রস্তুত, যার পরমপ্রভু হতে হবে একমাত্র ভগবানকে — আর তাহ'লে সমস্ত কষ্ট প্রশান্তিতে পরিণত হবে, সমস্ত মনস্তাপ শান্তিতে। ২০ নভেম্বর ১৯৫৪

*

ভগবানকে আমাদের মধ্যে এত জাগ্রতভাবে অনুভব করি যে যা কিছু হবে তার জন্য প্রশান্ত চিত্তে অপেক্ষা করি, একথা আমরা জানি যে তিনি আমাদের মধ্যে রয়েছেন আর তাই আমাদের সমস্ত পথে তিনি আছেন। ২৪ নভেম্বর ১৯৫৪

*

ভগবানের মহিমা সকল পরাজয়কে অসীমের বিজয়ে রূপান্তরিত করে, তাঁর বিচ্ছুরিত উজ্জ্বলতায় সকল ছায়া অপসারিত হয়েছে। ৯ ডিসেম্বর ১৯৫৪

*

ভগবানের উপস্থিতি আমাদের শক্তিতে আনে শান্তি, কার্যে আনে প্রশান্তি আর সকল পরিস্থিতিতে আনে অনাবিল সুখ। ১৩ ডিসেম্বর ১৯৫৪

*

ভগবান অবিমিশ্র সুখ, আনন্দপূর্ণ শুভ, কিন্তু এই শুভ তখনই সর্বসুন্দর হয় যখন তা হয় পূর্ণাঙ্গ। ২২ ডিসেম্বর ১৯৫৪

*

ভগবান সেই সদা নির্ভরযোগ্য বন্ধু সেই শক্তি, সহায় ও পথপ্রদর্শক যিনি কখনও সরে দাঁড়ান না। ভগবান সেই আলোক যা অন্ধকার দূর করে, সেই বিজেতা যে জয় সুনিশ্চিত করে। ২৩ ডিসেম্বর ১৯৫৪

*

একমাত্র ভগবানই সেই সহায় যা কখনও ব্যর্থ হয় না।

*

একমাত্র ভগবান সর্বদাই সাড়া দেন।

একমাত্র ভগবানের ভালবাসা কখনও ব্যর্থ হয় না।

একমাত্র ভগবানকেই ভালবাস এবং ভগবান সর্বদা তোমার সঙ্গে থাকবেন।

৬ অগাস্ট ১৯৬৩

*

কেবলমাত্র পরমপ্রভুর মতামতের গুরুত্ব আছে।

কেবলমাত্র পরমপ্রভু আমাদের সমস্ত ভালবাসা লাভের যোগ্য এবং তিনি তা শতগুণে প্রত্যর্পণ করেন।

*

তোমার অন্তরাত্মা যেন কেবল ভগবানে আস্থা রাখে।

*

একমাত্র ভগবানের চিন্তা কর এবং ভগবান তোমার সঙ্গে থাকবেন।

*

একটিই কাজ, একটিই লক্ষ্য, একটিই আনন্দ — ভগবান।

*

নিজেকে নিয়ে বিব্রত থাকার অর্থ অবক্ষয় ও মৃত্যু। একমাত্র ভগবানে মনোনিবেশ কর, তাহলে আসবে জীবন, বৃদ্ধি ও আত্মোপলব্ধি।

*

ভগবানকে বাদ দিয়ে জীবন বেদনাদায়ক মায়া, ভগবানকে সাথে নিলে সবই আনন্দময়।

*

আদর্শ মনোভাব হ'ল একমাত্র ভগবানের হওয়া, একমাত্র ভগবানের জন্য কাজ করা এবং সর্বোপরি একমাত্র ভগবানের কাছ থেকে শক্তি, শান্তি ও সন্তুষ্টি প্রত্যাশা করা। ভগবান অসীম কৃপাময় এবং যতদূর সম্ভব শীঘ্র লক্ষ্যে পৌঁছানর জন্য যা কিছু প্রয়োজন তা সবই প্রদান করেন।

*

দিব্য উপস্থিতিতে রয়েছে জীবনের মূল্য। এই দিব্য উপস্থিতি সকল শান্তি, সকল আনন্দ ও সকল নিরাপত্তা নিয়ে আসে। তোমার মধ্যে এই উপস্থিতি নিয়ে এসো এবং তোমার সমস্ত বাধাবিঘ্ন দূর হয়ে যাবে।

*

দিবারাত্র সবসময় রয়েছে দিব্য উপস্থিতি।

এর জন্য নীরবে অন্তর্মুখী হওয়াই যথেষ্ট এবং তাহলেই তা খুঁজে পাবে।

*

সর্বদা ভগবানকে স্মরণ কর এবং যা কিছু তুমি কর তা হবে দিব্য উপস্থিতির অভিপ্রকাশ।

*

কাজের মধ্যে এবং নীরবতায় দেওয়া ও নেওয়ায়, সর্বদা *তোমাকে* আনন্দের সঙ্গে স্মরণ।

*

নদী যেমন সমুদ্রের দিকে যায়, আমাদের সমস্ত চিন্তা, সমস্ত অনুভূতি ভগবানের দিকে প্রবাহিত হবে।

*

সকল চিন্তা, সকল অনুভূতি, সকল কাজ, সকল আশা যেন ভগবানের প্রতি যায় এবং তার মধ্যে কেন্দ্রিত হয়। তিনি আমাদের একমাত্র সহায় এবং আমাদের একমাত্র নিরাপত্তা।

*

হ্যাঁ, বাছা, একথা অতি সত্য যে ভগবান একমাত্র রক্ষাকর্তা — তাঁর মধ্যে রয়েছে সম্পূর্ণ নিরাপত্তা। (সমাপ্ত)

উৎস: *Words of the Mother*, Cent. Edi. Vol. No. 14, PP. 11-16,
অনুবাদ: মনোজ ভট্টাচার্য

সাধনা ও জীবন

(নির্বাচিত অংশ)

শ্রীমা

তোমার জীবন

কেবল মাত্র অজ্ঞানতা, অচেতনতা এবং অহং-এর নিয়ন্ত্রণকে উৎসর্গ করার বিষয়েই আমি বলছি, — আর তার পরিবর্তে কি বিস্ময়কর ও অতুলনীয় প্রাপ্তি! ৭ মে ১৯৩৭

*

তোমার জীবন হয়ে উঠুক সার্থকপূর্ণ।

*

অবিরাম সত্যের অন্বেষণে ব্রতী হয়ে উঠুক তোমার জীবন এবং সেটিই হয়ে উঠবে জীবনযাপনের সার্থকতা।

*

পরমেশ্বরের দ্বারা তোমার সমগ্র জীবন নিয়ন্ত্রিত হোক সম্পূর্ণভাবে এবং অবিমিশ্রভাবে।

*

তোমার জীবনকে সুসংগঠিত করুক তোমার উচ্চতম আস্পৃহা।

*

তোমার ব্যাকুলতাকে করে তোল প্রদীপ্ত ও আন্তরিক এবং কখনো ভুলে যেও না যে তুমি হচ্ছো ভগবানের সন্তান; এটিই তোমাকে নিবারণ করবে এমনকিছু করা থেকে যা ভগবানের সন্তানের অনুপযুক্ত।

*

সকল কিছুই নির্ভর করে প্রত্যেকের মনোভাবের উপর এবং তার নিজেকে প্রকাশের আন্তরিকতায়।

*

সকল কিছুই নির্ভর করে আন্তর মনোভাবের উপর। ১৭ এপ্রিল ১৯৪৭

পরিবর্তন

প্রতিকার করা ও নিশ্চিহ্ন করা : উভয়ই সম্ভব, কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই, তা বিভিন্ন মানের হলেও, প্রকৃতির এবং চরিত্রের একটি রূপান্তরের প্রয়োজন। যা ভুল করা হয়েছে তার নিজের করা কর্মের পরিণতির পরিবর্তন প্রত্যাশা করার পূর্বে, তাকে প্রথমে নিজের মধ্যে পরিবর্তন করতে হবে। ১১ জানুয়ারী ১৯৫১

*

যখন মানুষ আন্তরিকভাবে তাদের চেতনার পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা করে তখনই তাদের কর্মধারারও পরিবর্তন করা যেতে পারে।

*

চেতনার এক পরিবর্তন, আর যখন আমাদের চেতনার পরিবর্তন হবে তখন আমরা জানতে পারব কি পরিবর্তন হয়েছে।

*

পরিবর্তন কর ...

১। ঘৃণাকে সুসামঞ্জস্যে
২। ঈর্ষাকে সহৃদয়তায়
৩। অজ্ঞানতাকে জ্ঞানে
৪। অন্ধকারকে আলোয়
৫। মিথ্যাচারকে সত্যে
৬। দুর্নীতিকে সাধুতায়
৭। যুদ্ধকে শান্তিতে
৮। ভয়কে নির্ভীকতায়
৯। অনিশ্চয়তাকে নিশ্চয়তায়
১০। সংশয়-সন্দেহকে বিশ্বাসে
১১। বিশৃঙ্খলাকে শৃঙ্খলায়
১২। পরাজয়কে বিজয়ে ৯ অক্টোবর ১৯৫১

*

স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলা
ভ্রাতৃত্ব ও স্বাতন্ত্র
সমতা ও ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগ
একতা ও বিভিন্নতা
প্রাচুর্য ও দুর্লভ

প্রচেষ্টা ও প্রশান্তি
শক্তি ও করুণা
বিচক্ষণতা ও হিতৈষণা
ঔদার্য ও মিতব্যয়িতা

*

পরিবর্তন : উপলব্ধির প্রারম্ভ।

*

পরিবর্তন : সত্তার সকল প্রকার গতি প্রবৃত্তিকে ভগবানের অভিমুখে চালনা।

*

পুনরুত্থান : পুরনো চেতনার খসে পড়া, আর এর ভিতর থেকেই জাগরণ হয় পবিত্র সত্তার।

*

নতুন জন্ম : শুদ্ধ চেতনার জন্ম, যা আমাদের অভ্যন্তরের দিব্য উপস্থিতি।

*

উপলব্ধি : আমাদের সকল প্রচেষ্টার লক্ষ্য।

*

উপলব্ধি : এটিই সেই যার জন্য আমরা আকুল আস্পৃহা করি এবং যতই দীর্ঘ হোক তার জন্য আমরা অবিরাম কঠোর সংগ্রাম করে চলব।

*

উপলব্ধির শক্তি : উপলব্ধির সাথে সাথে সকল বাধা বিপত্তিকে জয় করা যাবে।

উৎস : *Words of the Mother*, Cent. Edi. Vol. No. 15, PP. 238-241,
অনুবাদ : অরুণ বসাক

ভগবান রয়েছেন
ভগবান আছেন এ এক জীবন্ত সত্য ...
আর প্রতিবারই যে কোন সামান্য বস্তুই
তা সে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ হোক না কেন
তোমাকে ভগবানের অস্তিত্বের
এক অপরূপ আনন্দের সংস্পর্শে নিয়ে আসে ...

—শ্রীমা

উৎস : Cent. Edi. Vol. No. 6, অনুবাদ : কানুপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়

ধূমপান, মদ ও মাদকদ্রব্য
শ্রীমা

মদ্যপান ও মাদকদ্রব্য : আত্মসংযম[১]

[বিরোধীসত্তা ছাড়াও] মানুষের ভিতর অনেকে আছে যারা অপকর্মকে প্রশ্রয় দেয় — কোন-না-কোন অপকর্ম, যেমন মদ খাওয়া বা ড্রাগ ইনজেকশন নেওয়া — এবং তারা ভাল করেই জানে যে এসব তাদের ধ্বংসের দিকে, মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে চলেছে। তবু তারা জেনেশুনে সে জিনিসই করে।

তাদের নিজেদের ওপর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই।

আত্মসংযমের জন্য সবক্ষেত্রেই একটা সময় থাকে। যদি-না সে একবার 'হ্যাঁ' বলত, যদি-না সে একবার সিদ্ধান্ত নিত, সে কখনই জিনিসটা করত না।

মানুষের মধ্যে একজনও নেই, চাপিয়ে দেওয়া জিনিসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করার শক্তি ও সামর্থ্য যার না আছে — অবশ্য যদি তাকে প্রতিরোধ করার স্বাধীনতা দেওয়া হয়। লোকে বলে, ''না ক'রে পারি না'' — সেইরকম হয় কেননা অন্তরের গভীরে তারা চায় না অন্যরকম করতে। তারা তাদের অপকর্মের দাস হয়ে থাকতে সম্মত হয়েছে। একটা সময়ে সে তা বরণ করে নিয়েছে।

তামাক এবং অ্যাল্‌কহল[২]

তামাক এবং অ্যাল্‌কহল কেন স্মৃতিশক্তি ও সঙ্কল্পশক্তিকে নষ্ট করে?

কেন? কেননা তারা তাই করে বলে। কোন নৈতিক কারণ নেই। এটা বাস্তব ঘটনা। অ্যাল্‌কহলের মধ্যে বিষ আছে, তামাকের মধ্যে বিষ আছে, আর এই বিষ দেহের কোষের মধ্যে প্রবেশ করে এবং সেসব নষ্ট করতে থাকে। অ্যাল্‌কহল, বলতে গেলে, দেহ থেকে মোটেই পরিত্যক্ত হয় না; মস্তিষ্কের অংশবিশেষে তা জমা হতে থাকে এবং তারপর, জমবার পর এইসব কোষগুলো আর মোটেই কাজ করে না — কেউ কেউ এই কারণে পাগল পর্যন্ত হয়ে যায়, যাকে বলা হয় ডিলিরিয়ম ট্রেমেন্স (delirium tremens)। খুব বেশি অ্যাল্‌কহল খেলে এই পরিণাম হয়। এই অ্যাল্‌কহল কোনরকম পরিপাক না হয়ে মাথায় গিয়ে এইরকম জমে। আর এই জিনিস এতই বহুল প্রচলিত যে ... উদাহরণস্বরূপ, ফ্রান্সে একটি অঞ্চল আছে যেখানে মদ প্রস্তুত হয়, সে মদে অ্যাল্‌কহলের পরিমাণ খুব কম থাকে: আমার মনে হয় শতকরা চার কি পাঁচভাগ

মাত্র, খুব সামান্য পরিমাণে, বুঝেছ; এখন এই লোকেরা, যেহেতু তারা তৈরী করছে, জল খাওয়ার মতো মদ খায়। তারা কোন কিছু না মিশিয়েই মদ খায়, আর কিছুকাল পরে তারা অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাদের মাথার গণ্ডগোল হয়। আমি এরকম কিছু লোককে জানি, তাদের মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছে, কোন কাজ করে না। আর তামাক — নিকোটিন হচ্ছে ভয়ানক বিষাক্ত একটি জিনিস। এই বিষ দেহকোষকে ধ্বংস করে। আমি বলেছি এই বিষ ধীরে ধীরে ক্রিয়া করে, কেননা লোকে তক্ষুনি এর ফল বুঝতে পারে না — কেবল যখন কেউ প্রথমবার ধূমপান করে সেইসময় খুব অসুস্থ হয়ে পড়া ছাড়া। আর এতেই তোমার বোঝা উচিত যে ধূমপান করা উচিত নয়। শুধু লোকেরা এতই মূর্খ যে ভাবে সেটা একটা দুর্বলতা আর কাজেই সেকাজ করতেই থাকে যতদিন না সেই বিষে তারা অভ্যস্ত হয়ে যায়। আর শরীরে কোন প্রতিক্রিয়া হয় না, কোন প্রতিক্রিয়া না দেখিয়ে শরীর নিজেকে নষ্ট হতে দেয় : তুমি প্রতিক্রিয়া হতে অব্যাহতি পাও।

নৈতিক চরিত্রগত জিনিসের মতো শরীরেও ওই একই ব্যাপার। তুমি যখন এমন কিছু কর যা করা উচিত নয়, তোমার চৈত্যপুরুষ একটা স্থির এবং ক্ষীণ কণ্ঠে জানায় সেটা না করতে, তা সত্ত্বেও তুমি যদি তা করতে থাক, তবে কিছুকাল পরে সে আর তোমাকে কিছু বলবে না এবং তোমার মন্দ কাজের জন্য আর ভিতরে কোন প্রতিক্রিয়াও হবে না, কেননা সেই কণ্ঠ যখন এসেছিল, তুমি তা শুনতে অস্বীকার করেছিলে। আর তারপর, স্বভাবতই তোমার গতি মন্দ হতে মন্দতর অবস্থার অভিমুখে ধাবিত হয় এবং তুমি গর্তের মধ্যে গিয়ে পড়। বেশ, এখন তামাকের ব্যাপারেও একই জিনিস : প্রথমবার শরীর খুব জোরের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া করে, সে বমি করে ফেলে, সে তোমাকে বলে, ''কিছুতেই আমি এ জিনিস চাই না।'' তুমি তোমার মনের ও প্রাণের মূঢ়তা দিয়ে তাকে বাধ্য কর, তাকে ওই কাজ করতে জবরদস্তি কর। সে আর প্রতিক্রিয়া দেখায় না, নিজেকে ক্রমশ বিষাক্ত হতে দেয়, যতদিন না সে ভেঙে পড়ছে। শারীরিক ক্রিয়ার সব অবনতি ঘটতে থাকে; স্নায়ুগুলোই ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তারা ইচ্ছাশক্তি ধারণ করতে অক্ষম হয়, কেননা তারা তখন আক্রান্ত বিষাক্ত অবস্থায়। তাদের আর ইচ্ছাশক্তি বহন করার সামর্থ্য থাকে না। আর শেষে লোকেরা কাঁপতে থাকে, তাদের স্নায়ুজনিত আন্দোলন হয়। বেশ কিছুসংখ্যক এইরকম লোক আছে, ওদের দেখতে পাবার জন্য তোমাকে বেশি দূর যেতে হবে না। তারা ঐরকম হয়ে গিয়েছে শুধুমাত্র এই কারণে যে তারা বাড়াবাড়ি করেছে : তারা মদ খায়, ধূমপান করে। তারা যখন একটা জিনিস তোলে, তাদের হাত কাঁপে *(ভঙ্গি ক'রে দেখালেন)*। কাজের এইরকম ফল তারা পায়।

উৎস : ১ : Cent. Edi. Vol. No. 8, P.5, ২ : Cent. Edi, Vol. No. 6, PP. 74-76,
অনুবাদ : পীযূষ গুপ্ত

এই নীরব নিস্তরঙ্গ শান্ত মনের অবস্থাকে ধরে রাখতে জানা চাই।... শ্রীঅরবিন্দ যখন এই অবস্থায় থাকতেন,... তখন ... দিব্যজ্ঞান তাঁর মধ্যে দিয়ে অবিরতধারে প্রবাহিত হয়ে চলত। তিনি টাইপরাইটারে শুধু আঙুল চালিয়ে যেতেন, এবং সেই ঊর্ধ্বতম জ্ঞানসম্পদ তাঁর মধ্যে দিয়ে ভাষায় ভর করে আর্য পত্রিকার প্রবন্ধ হয়ে বেরিয়ে আসত।

শ্রীমা

''আমি ধৈর্য ধরে অপেক্ষায় রইলাম ... নতুন মনের গঠন তুমি দেবে বলে, যা তোমাকে প্রকাশ করার হবে সবচেয়ে উপযোগী।'' — আরও বিশদ করে বল।

শ্রীমা : সাধারণত মনের থাকে একটা কাঠামো — লোকেরা ভাবে, চিন্তা করে বোঝে এক বিশেষ ধরনে। কিন্তু সত্য উপলব্ধি একবার হলে মনের অভ্যাস মতো ধারণার শক্তি একেবারেই চলে যায়। কারণ, মানুষ তখন যে অবস্থা লাভ করে তা ঢের বেশি উঁচু স্তরের বস্তু। সুবিশাল নৈঃশব্দের মাঝে বিরাজমান তার চেতনা জ্ঞানের আলোকে ভাস্বর, যে জ্ঞানের উৎপত্তি বহু ঊর্ধ্বে এবং তার প্রকৃতি সাধারণ মনের চেয়ে সহস্রগুণ ব্যাপক। সেই শূন্য মনের অবস্থা এমনই অনুপম হয়ে ওঠে যে তার মাঝে কোন বিতর্ক, কোন বিরোধ, কোন চিন্তার সংঘর্ষ নেই, ওসবের অস্তিত্বই নেই। সেখানে আছে শুধু এক জ্যোতির বিকাশ, বহু ঊর্ধ্ব থেকে তা বিচ্ছুরিত হচ্ছে, এবং তার মাঝে রয়েছে এক সর্বব্যাপী ভাস্বর জ্ঞানময় চেতনা — মানুষকে যা প্রতি মুহূর্তে ঠিক যেমনটি যা করা দরকার তার নির্দেশ দিচ্ছে, কোনরকম বিচার বিবেচনার গণ্ডির মধ্যে তাকে যেতে হচ্ছে না সে জন্যে। যথার্থ বোধের, অভ্রান্ত ধারণার এই হল উপায়। অখণ্ড নীরবতা, অবিচলিত প্রশান্তির মাঝে তা বিধৃত। একেই আমি বলেছি নতুন মন, যা দিব্যবার্তা প্রকাশের সবচেয়ে উপযোগী হবে।

তাই অন্যদেরও যদি কিছু বোঝাতে হয়, যদি তাদের কিছু জ্ঞান দান করতে হয়, তো তার শ্রেষ্ঠ অব্যর্থ উপায় হল নিজে সেই জ্ঞানকে উপলব্ধি করা সেই জ্ঞানের চেতনায় বাস করা; মন দিয়ে বুঝে শুধু কথার বাঁধনে ফেলে ভাষায় প্রকাশ করা নয়। এই জ্ঞান সঞ্চারিত হয় ভাষায় ভর করে নয়; অন্তরের সচেতন ভাবতরঙ্গের প্রকম্পনের দ্বারা অন্যদের চেতনায় এই জ্ঞান সঞ্চারিত হয়। যারা তা গ্রহণের উপযোগী চেতনাতে বাস করছে তারা ঠিক তা পেয়ে যায়, মুখের কথায় বলে বুঝিয়ে এ জ্ঞান দিতে হয় না। চেতনার তরঙ্গহিল্লোল তাদের অন্তরে গিয়ে পরশমণির পরশ দেয়, আর তার ফলে

জেগে ওঠে তাদের চেতনা। ফুটে ওঠে এই জ্ঞান সম্পদ, আর তখন তা তাদের বাহ্য চেতনায় মনের পথে আত্মপ্রকাশ করে। প্রাচীন অধ্যাত্ম জ্ঞানীরা, আচার্যরা এই পন্থাই অবলম্বন করে শিষ্যদের মধ্যে জ্ঞানসঞ্চার করতেন। এই প্রত্যক্ষ জ্ঞানসঞ্চারের পদ্ধতি তারা জানতেন। তাঁরা শান্ত মৌনতার মাঝে নির্বাক অবস্থায় অন্যদের অন্তরে একটা চেতনার আলোড়নের সৃষ্টি করে জ্ঞানবস্তুকে জাগিয়ে দিতেন, এবং তখন তা প্রত্যেকের ভাবে, প্রত্যেকের মনের মধ্যে নিজের নিজের প্রচলিত ভাষায় ফুটে উঠত। শিক্ষার এই পদ্ধতিতে জ্ঞানকে সূত্রের আকারে ফেলে মনের দ্বারে পৌঁছে দিতে হয় না। তা সরাসরি অন্তরে গিয়ে পৌঁছয় এবং তারপর যে যার নিজের মনের ধরন ও সামর্থ্য অনুসারে নিজের ভাষায় তাকে রূপ দেয়। এ হল যেন এক পরশমণি। এর পরশ অন্তর্লোকে লাগতেই জেগে ওঠে চেতনার তরঙ্গ অনুভূতি, এবং তারপর তা বাহ্যচেতনার রাজ্যে অভিব্যক্ত হয় প্রত্যেকের অভ্যস্ত ভাষায়। একজন ব্যক্তি ভিন্ন ভাষাভাষীদের মাঝে এইভাবে চেতনার তরঙ্গ সৃষ্টি করে জ্ঞান সঞ্চার করতে পারে এবং প্রত্যেকেই তা ঠিক ঠিক ধরে নিতে পারবে এবং নিজের নিজের ভাষায় তা বর্ণনা করতে পারবে।

''অনন্ত সম্ভাবনায় ভরপুর এই বিশাল রাত্রিকাল'' — মানে কি?

শ্রীমা : হ্যাঁ, ওই যে আগে বলেছি এই ধ্যানলিপিটিতে, ''মনের সকল ক্রিয়া বিলুপ্ত, যেন নবজাত শিশুর মতন অজ্ঞানের অবস্থা।''

সকল চিন্তারই আছে এক বিশেষ মানসিক ধরন। মন তাদের গড়ে তোলে অর্থাৎ মনের এক একটি অংশ তারা। সকল চিন্তার স্রোত যখন স্তব্ধ, মনের সকল ধারা যখন বিলুপ্ত, তখন শুধু এক অখণ্ড শূন্য বিরাজমান। এ এক অনির্বচনীয় অবস্থার উপলব্ধি। এতকাল ধরে যে মন এতভাবে এত চিন্তা, এত ভাব, এত ভাবনার সমুদ্রমন্থন করছিল, হঠাৎ সেসব এক নিমেষে উবে যাবে, সব অদৃশ্য হয়ে যাবে, চিন্তার কোন তরঙ্গ উঠবে না — মানুষ কি তা ভাবতে পারে? কোন একটা বিষয় যখন তোমরা শিক্ষা লাভ করছ, ধীরে ধীরে তা বুঝছ, সে সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করছ। মন সে সম্বন্ধে একটা বিশেষ ছক এঁকে, তাকে পাকা করে অন্তরে গেঁথে রাখছে। তোমাদের ধারণা যে এই ছকটি তোমাদের অভিজ্ঞতাকে ঠিক ঠিক প্রকাশ করতে পেরেছে। তারপর হঠাৎ কোথাও কিছু নেই, একদিন দেখলে যে সব ভেঙেচুরে বিলীন হয়ে গেছে! এতদিন যা সত্য অভিজ্ঞতা বলে জেনে আসছিলে, তার চিহ্নমাত্র নেই আর! প্রায়ই দেখা গেছে যে মানুষ এই অবস্থা সহ্য করতে পারে না। মন একেবারে শূন্য হয়ে গেল, — সে কি ব্যাপার! কোন ভাবনার উপায় নেই, কিছুই বোঝবার

সম্ভাবনা নেই! এই অবস্থাকে সে পাগলের, উন্মাদের অবস্থা বলে ভয় পায়। এবং সত্যিই তাতে সে এতদূর ঘাবড়ে যায় যে মরিয়া হয়ে ছোটে আগেকার সেই পুরনো মনকে ফিরে পেতে, এবং যতক্ষণে আবার সেই পুরনো অবস্থা ফিরে না পাচ্ছে, ততক্ষণ তাদের শান্তি নেই। ফলে কি হয় তখন? যে অপূর্ব অবস্থা তারা লাভ করেছিল সেটা হারায়, এবং আবার পূর্ব অবস্থায় ফিরে যায়। সেই আগেকার অভ্যস্ত মনের চিন্তা, জল্পনা, কল্পনা, আর যতরকমের কসরত করতে থাকে সে আবার। তখন সে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে।

কিন্তু ওটাকে কি সত্যিই বাঁচা বলে? ওরকম অবস্থায় মানুষ পৌঁছলে তখন তার কি করা উচিত বলো দেখি? উচিত, একেবারে চুপটি করে থাকা, কোন রকমে ভয় পাওয়া নয়, বিচলিত হওয়া নয়, বা পুরনো মনকে ডাক দিয়ে ফিরিয়ে আনা নয়। দৃঢ় সঙ্কল্প করে, অসীম ধৈর্য ধরে চুপটি করে থাকা। কি আসে তার অপেক্ষায়! একেবারে নির্বিকার, নির্লিপ্তভাবে, একান্ত নির্ভরে থাকা। কোন ভাবনাচিন্তাকে প্রশ্রয় দেওয়া নয়, কোন জল্পনাকল্পনা নয়, কোন কিছু আঁচ করা নয়, অভ্যাসগত মনের কোন কসরত নয়। নাহলে সব মাটি হয়ে যাবে। ওই দুর্লভ অবস্থা আর থাকবে না। তাই খুব সতর্ক হয়ে প্রাণপণে ওই অবস্থা বজায় রাখতে পারলে এবং মন একেবারে নিশ্চল, নিস্তরঙ্গ, শান্তির আকর হয়ে গেলে শুধু ঊর্ধ্বের পানে একান্ত আকূতি নিয়ে থাকা, তবেই অপেক্ষা যথার্থ সত্য হয়। তখন বহু ঊর্ধ্ব থেকে এক জ্যোতি অবতরণ করে অন্তরের সেই নিস্তব্ধ পুরীতে, অসাধারণ এক শক্তি মনকে অধিকার করে এবং অভূতপূর্ব এক প্রকাশভঙ্গি খুলে যায়। তাহল অনন্ত জ্ঞানের এক বিন্দু, যেন নির্যাসমাত্র। এ এক অমূল্য সম্পদ। মনের কোন ক্ষমতা নেই একে বর্ণনা করার — কারণ এ বস্তু মনের নয়, মনের ধারণার মধ্যে এ আসে না। এহল অধ্যাত্ম জ্ঞানের সার।

এই নীরব নিস্তরঙ্গ শান্ত মনের অবস্থাকে ধরে রাখতে জানা চাই। তাহলেই মানুষের মধ্যে দিয়ে অভূতপূর্ব অলৌকিক রহস্য জগতে প্রকাশের সম্ভাবনা থাকে।

শ্রীঅরবিন্দ যখন এই অবস্থায় থাকতেন, তখন তিনি আহার নিদ্রা ত্যাগ করে কেবল লিখে যেতেন। সেই দিব্যজ্ঞান তাঁর মধ্যে দিয়ে অবিরতধারে প্রবাহিত হয়ে চলত। তিনি টাইপরাইটারে শুধু আঙুল চালিয়ে যেতেন, এবং সেই ঊর্ধ্বতম জ্ঞানসম্পদ তাঁর মধ্যে দিয়ে ভাষায় ভর করে আর্য পত্রিকার প্রবন্ধ হয়ে বেরিয়ে আসত। সমগ্র ''আর্য'' এবং আর অন্য যাকিছু তিনি লিখেছেন, সব তাঁর ওইভাবে লেখা — শূন্য নিস্তরঙ্গ মনের অবস্থায়, অখণ্ড নীরবতার মাঝে। ওইভাবে লিখতে শিখলে মানুষ কখন ক্লান্তিবোধ করে না, কখন তার মাথা ব্যথা করে না। এই নীরবতার অবস্থা আমি ওই সময়ে লাভ করি তাঁর কাছ থেকে। তিনিই এই নীরবতা আমার মধ্যে সঞ্চারিত করে দেন ওই ১৯১৪ সালে। তারই বর্ণনা এই ধ্যানলিপিতে তোমরা পড়লে আজ।

এরপর থেকে কখন আর আমার ও অবস্থার পরিবর্তন হয়নি। যখনই আমাকে ভাষায় কিছু ব্যক্ত করতে হয়, তখনই ঊর্ধ্ব থেকে আমি সেই ভাবটি পেয়ে থাকি। সেটি নেমে আসে কপালের কাছ বরাবর একটা স্তর পর্যন্ত। সেখানে এসে তা যেন ভাষার ভাণ্ডারে প্রবেশ করে, এবং উপযোগী ভাষা সংগ্রহ করে নিয়ে তার দ্বারা বাইরে প্রকাশ করে দেয়। কথা বলার এই হল কৌশল।

উৎস : মৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায় : ***শ্রীমায়ের পাঠশালা***

মায়ের কাছে সমর্পণ

(নির্বাচিত অংশ)

শ্রীঅরবিন্দ

(পূর্বসংখ্যা ২১ ফেব্রুয়ারী ২০১৫-এর পর)

ক্রমিক উন্মীলন

উন্মীলন সব সময়েই প্রথম থেকে পুরোপুরি ভাবে হয় না — সত্তার একটা অংশ যদি খোলে তো চেতনার অন্যান্য অংশগুলি থাকে তখনও বন্ধ বা অর্ধ-খোলা হয়ে — আস্পৃহা করতে করতে তবে সব খোলে। এমন কি খুব উৎকৃষ্ট শক্তিমান সাধকদেরও পুরো উন্মীলন হতে সময় লাগে; এমনও কেউ নেই যে বিনা সংগ্রামে সব কিছু তৎক্ষণাৎ ছাড়তে পেরেছে। সুতরাং একথা মনে করার কোনো কারণ নেই যে তোমার ডাক কেউ শুনবে না — মা মানব প্রকৃতির ত্রুটিগুলির কথা যথেষ্টই জানেন, তিনি বরাবর তোমাকে সাহায্য করবেন। অধ্যবসায় নিয়ে সর্বদাই মাকে ডাকো, তাহলে দেখবে প্রত্যেক বাধাবিপত্তির পরে কিছু উন্নতি হয়েছে। ২০-৪-১৯৩৫

আভ্যন্তরীণ ও উচ্চতর উন্মীলন

নিত্য স্মরণ মনন করতে করতে তবে সত্তাটি পূর্ণ উন্মীলনের জন্য প্রস্তুত হয়। হৃদয়ের উন্মীলন হলে তখন মায়ের উপস্থিতি অনুভব হতে থাকে, আর উপরে মায়ের শক্তির দিকে উন্মীলন হলে তখন উচ্চ চেতনার শক্তিধারা দেহের মধ্যে নেমে এসে সমগ্র প্রকৃতির পরিবর্তন আনতে কাজ করে। ৭-৮-১৯৩৪

*

এই সাধনাতে মন্ত্র বলতে কেবল মায়ের মন্ত্র কিংবা আমার ও মায়ের নাম। আর একাগ্রতা আনা হৃদয়ে কিংবা মাথায় দুই স্থানেই হতে পারে — প্রত্যেকটির ফল হয় তার নিজস্ব। প্রথমটিতে আসে চৈত্যের উন্মীলন এবং ভক্তি, প্রেম ও মায়ের সঙ্গে মিলন, হৃদয়ে মায়ের উপস্থিতি বোধ এবং প্রকৃতির মধ্যে তাঁর শক্তির ক্রিয়া। দ্বিতীয়টিতে

হয় আত্মোপলব্ধির দিকে মনের উন্মীলন, মনের উপরকার চেতনাতে ও দেহোত্তর চেতনাতে উত্থান, আর দেহেতে উচ্চতর চেতনার অবতরণ। ১৩-১০-১৯৩৪

*

এই যোগের পদ্ধতি বলতে তেমন কিছু নেই, কেবল একাগ্রতা আনা, সাধারণত হৃদয়ে,আর মায়ের উপস্থিতি ও শক্তিকে আহ্বান করতে থাকা, যেন তিনি সত্তাটির ভার নিয়ে তাঁর শক্তির ক্রিয়াতে চেতনার রূপান্তর ঘটান। মাথায় কিংবা ভ্রূমধ্যেও একাগ্রতা আনা যায়, কিন্তু অনেকের পক্ষে তা কঠিন হয়। মন যখন নীরব হয়ে যায় আর একাগ্রতা ও আস্পৃহা প্রবল হয় তখন অনুভূতি আসতে শুরু হয়। বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা যত বেশি তার ফলও তত শীঘ্র আসতে পারে। তা ছাড়া কেবল নিজের চেষ্টার উপরে নির্ভর করাই যথেষ্ট নয়, ভগবানের সঙ্গে কিছু সংস্পর্শ স্থাপন করা চাই, মায়ের শক্তিকে ও উপস্থিতিকে পাবার মতো গ্রহিষ্ণু হওয়া চাই।

*

চৈত্য কেন্দ্রের সরাসরি উন্মীলন তখনই সহজ হতে পারে যখন অহং-কেন্দ্রিকতা একেবারে কমে যায় আর যখন মায়ের প্রতি ভক্তি খুব প্রগাঢ় হয়। একটা আধ্যাত্মিক দীনভাব এবং আনুগত্য ও নির্ভরতা থাকা খুব দরকার। ১৬-৭-১৯৩৬

*

হ্যাঁ, মনকে নীরব করলে তবেই তুমি মাকে ভালোভাবে ডাকতে পারবে আর মায়ের দিকে নিজেকে উন্মীলিত করতে পারবে। তোমার চৈত্য থেকেই অমন শান্তিময় স্পর্শ ঘটেছিল, ওতে তোমাকে প্রস্তুত ক'রে দেয় চৈত্যের উন্মীলন ও সেই সঙ্গে আভ্যন্তরীণ শান্তি ও প্রেম ও আনন্দের আগমন। ১৭-৯-১৯৩৪

*

মায়ের শান্তি রয়েছে তোমার উপর দিকেই — তোমার মধ্যে তা নেমে আসবে আস্পৃহা ও নীরব আত্মোন্মীলনের ফলে। যখন তা প্রাণসত্তা ও দেহকে অধিকার করবে, তখন সমতা আনা সহজ হবে ও পরে তা আপনা আপনি হবে। ২৮-৮-১৯৩৩

অন্য শক্তিদের এড়িয়ে মায়ের শক্তির দিকে উন্মীলন

মায়ের শক্তির দিকে নিজেকে খুলে দাও, কিন্তু সকল শক্তিকে বিশ্বাস কোরো না। এই ভাবে সোজা পথে যদি চলতে থাকো তাহলে এক সময় চৈত্য আরো সক্রিয় হয়ে উঠবে আর উপরের আলো এসে এমন জোর দীপ্তি দেবে যে তখন খাঁটি অনুভূতির সঙ্গে মন ও প্রাণের তৈরি কোনো কিছু মিশ্রণের সম্ভাবনাই থাকবে না। আগেই বলেছি যে এগুলি অতিমানস শক্তি হতে পারে না; কেবল প্রস্তুতির কাজ হচ্ছে ভবিষ্যৎ যোগসিদ্ধি আনার জন্য। ১৮-৯-১৯৩২

*

মায়ের শক্তি তোমার মধ্যে কাজ করুক, কিন্তু সতর্ক থেকো যেন তার জায়গাতে মিশ্রণ বা অন্য কিছু না আসে, অহং-ক্রিয়া যেন বেড়ে না ওঠে কিংবা অজ্ঞানতার শক্তি নিজেকে সত্য বলে জাহির না করে। বিশেষ ক'রে আস্পৃহা রাখো যাতে প্রকৃতির ভিতরকার অন্ধকার ও অচেতনা দূর হয়।

মায়ের প্রতি বিশ্বস্ততা ও আনুগত্য

বিরোধী শক্তি কিছু এলে তাকে নেবে না, তার পরামর্শ শুনবে না, কেবল মায়ের দিকে ফিরে থাকবে, কিছুতে মুখ ফেরাবে না। উন্মীলন হোক বা নাই হোক, মায়ের প্রতি সর্বদা বিশ্বস্ত ও অনুগত হয়ে থাকবে। এসব গুণের জন্য যোগ দরকার হয় না। যে কোনো পুরুষ বা স্ত্রী, যারা সত্য কিছু চায়, তারা অনায়াসে এই মনোভাব আনতে পারে।

সাফল্যের একমাত্র উপায়

তোমার প্রকৃতির একটা প্রধান অংশে রয়েছে একটা অহং-ব্যক্তিত্বের সুদৃঢ় সংগঠন, যা তোমার আধ্যাত্মিক আস্পৃহার সঙ্গে মিশিয়ে রেখেছে আপন গর্ব ও আধ্যাত্মিক উচ্চাকাঙ্খার মনোভাব। এই দৃঢ় মনোভাবটি ভেঙে গিয়ে তার বদলে কিছু সত্য ও দিব্য জিনিসকে ঢুকতে দিতে কখনই সে রাজী হয়নি। তাই যখন মা তোমার মধ্যে তাঁর কিছু শক্তি দিয়েছেন, কিংবা তুমিই নিজের মধ্যে সেই শক্তিকে টেনেছ, তখন তোমার ঐ জিনিসই তাকে তার আপন রাস্তায় কাজ করতে দেয়নি। তোমার ঐ অংশটি চেয়েছে নিজের মনের ধারণা বা অহং-এর দাবী অনুযায়ী একটা নিজের মনোমত জিনিস গড়ে তুলতে, ''নিজের রাস্তায়'', নিজের জোরে, নিজের সাধনা ও তপস্যার দ্বারা। তার কারণে প্রকৃত সমর্পণ তোমার কখনই হয়নি, নিজেকে মায়ের হাতে মুক্ত ও সরলভাবে কখনই ছেড়ে দাওনি। অথচ এই অতিমানস যোগে তাই হলো একমাত্র উপায়। যোগী হওয়া, বা সন্ন্যাসী হওয়া, বা তপস্বী হওয়া এখানকার উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হলো রূপান্তর আনা, আর সে রূপান্তর আসতে পারে কেবল এমন শক্তির দ্বারা যা তোমার শক্তির চেয়ে অনন্তগুণে বৃহৎ; এবং তা হতে পারে কেবল মায়ের হাতে নিজেকে প্রকৃতই একটি শিশুর মতো সঁপে দিলে।

*

কারো বুদ্ধিজনিত জ্ঞান বা মনের বিচার বা প্রাণের কামনা প্রবল থাকার জন্য যদি সে নতুন চৈত্য জীবন পেতে অস্বীকার করে, যদি মায়ের কোলের নবজাত নিতান্ত শিশুর মতো থাকতে সে না চায়, তাহলে তার সাধনা ব্যর্থ হয়ে যাবে। (ক্রমশ)

উৎস: *Opening and Surrender to the Mother*, অনুবাদ : পশুপতি ভট্টাচার্য

প্রাণের রূপান্তর

শ্রীঅরবিন্দ

(পূর্বসংখ্যা ২১ ফেব্রুয়ারী ২০১৫-এর পর)

২) অবাধ্যতা এবং শৃঙ্খলাহীনতা। সত্তার এই নিম্নতর অংশটি নিজস্ব ভাবনা অথবা প্রবৃত্তি ব্যতিরেকে তার উপরে আরোপিত অন্য যে কোন নিয়ন্ত্রণ ও নিয়মানুবর্তিতাকে গ্রহণ করবার ক্ষেত্রে সর্বদাই বিশৃঙ্খল, স্বেচ্ছাচারী, নিজ দাবিতে পরিপূর্ণ ও অনিচ্ছুক হয়ে থাকে। এমনকি এর ত্রুটিগুলি শুরু থেকেই প্রকৃতির উপর এক যথার্থই নূতন করে সৃষ্ট তপস্যাকে স্থাপন করবার জন্য উচ্চতর প্রাণের প্রচেষ্টাগুলির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। নিয়মশৃঙ্খলার প্রতি অমান্যতা ও অশ্রদ্ধার এই অভ্যাস এতটাই শক্তিশালী যে নিম্নপ্রাণের সর্বদা কোন রকম বিশেষভাবে বিবেচনা করে দেখবার প্রয়োজন হয় না। এর প্রতিক্রিয়াকে তৎক্ষণাৎ, দুর্নিবার ও সহজাত প্রবৃত্তি প্রসূত বলেই মনে হয়। এইভাবে মায়ের প্রতি আনুগত্যের ক্ষেত্রে বারংবার প্রতিজ্ঞা অথবা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করা হয়, কিন্তু যে কাজটি করা হয় কিংবা যে আচরণটিকে অনুসরণ করা হয় তা প্রকাশ্য ঘোষণা অথবা প্রতিজ্ঞার থেকে বহুবারই সম্পূর্ণভাবে বিপরীত হয়ে ওঠে। এই অবিরামভাবে শৃঙ্খলাকে ভঙ্গ করা সাধনার ক্ষেত্রে এক মূলগত প্রতিবন্ধক। সেইসঙ্গে অন্যদের সামনে সম্ভাব্য নিকৃষ্টতম উদাহরণও বটে।

৩) কপটতা ও মিথ্যাভাষণ। এ হল নিম্নতর প্রকৃতির এক অত্যধিক রকমের ক্ষতিকারক অভ্যাস। যারা অকপট নয়, তারা মায়ের সাহায্য থেকে লাভবান হতে পারে না, কেননা তারা নিজেরাই সেই সাহায্যকে ফিরিয়ে দেয়। যদি না তারা পরিবর্তিত হয়ে ওঠে, তখন তারা নিম্নপ্রাণ এবং জড় প্রকৃতির মাঝে অতিমানস আলো ও সত্য অবতরণের আশা করতে পারে না। নিজেদেরই সৃষ্ট কাদামাটির মধ্যে তারা নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকে, আর কোন রকম উন্নতি করতে পারে না। প্রায়শই যা সাধকের মধ্যে লক্ষণীয় হয়ে উঠতে দেখা যায় তা কেবলমাত্র অতিরঞ্জন কিংবা যথার্থ সত্যের উপর অলঙ্কৃত কল্পনার এক মিথ্যা প্রয়োগই থাকে না, বরং এর অধিক তা হয়ে ওঠে এক নিশ্চিত অস্বীকার এবং বিকৃতি একই সঙ্গে সত্যকে গোপন করবার জন্য এক মিথ্যা বর্ণন। অনেকসময় সে এই রকম কাজ করে থাকে তার অবাধ্যতা অথবা কর্মাবলীর ভ্রান্ত বা সন্দেহজনক আচরণকে আবৃত করে লুকিয়ে রাখবার জন্য, কখনও বা তার সামাজিক মর্যাদাকে বজায় রাখবার জন্য, অন্যদের মাঝে নিজের ইচ্ছেমতো চলতে বা কাজ করতে পারবার জন্য অথবা তার বেশী পছন্দের অভ্যাস ও বাসনাগুলিকে প্রশ্রয় দেওয়ার কারণে। প্রায়শই যখন কারোর মাঝে এই ধরনের প্রাণিক অভ্যাসগুলিকে দেখা যায়, সে তখন তার নিজের চেতনাটিকেই মেঘাচ্ছন্ন করে তোলে আর সে যা

কিছু বলছে বা করছে তার ছলনার বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে কিছুই উপলব্ধি করতে পারে না। কিন্তু সে যত কিছুই বলুক এবং করুক না কেন, এমনকি এই সামান্যতম ক্ষমা প্রার্থনাকেও তার নিজের কাছে মেলে ধরাটি সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব ব্যাপার হয়ে ওঠে।

৪) নিজেকে অবিরামভাবে সমর্থন করে চলবার এক বিপজ্জনক অভ্যাস। যখন সাধকের মাঝে এই অভ্যাসটি শক্তিশালী হয়ে ওঠে তখন তাকে তার সত্তার এই অংশে যথার্থ চেতনা ও কর্মের অভিমুখে ঘোরানোটি অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। কেননা প্রতিটি পদক্ষেপে নিজেকে সমর্থন করাই তার সর্বাগ্রে করণীয় কর্ম হয়ে ওঠে। তার মন মুহূর্তের মধ্যে তীব্রবেগে নিজস্ব ভাবনা, নিজস্ব সামাজিক অবস্থান অথবা তার নিজস্ব কর্মাবলীর প্রবাহকে বজায় রাখবার জন্য ছুটে চলে। সে যেকোন ধরনের তর্কের সাহায্যে তা করবার জন্য প্রস্তুত থাকে, যাকে অনেকসময় অত্যন্ত জবরজঙ্গ ও বিচারবুদ্ধিহীন কিংবা মুহূর্ত খানেক আগে যে ব্যাপারে সে আপত্তি প্রকাশ করেছিল তারই সঙ্গে অসঙ্গত বলে মনে হয়। আর সে এসব করে থাকে যেকোন ধরনের মিথ্যা বিবৃতি বা যেকোন ফন্দির মাধ্যমে। এ হল একটি গতানুগতিক অন্যায় আচরণ, তা হলেও এটি চিন্তাশীল মনের এক অপব্যবহার। কিন্তু এই জিনিসটিকেই অতিরঞ্জিত অনুপাতে তার মধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে। আর যতদিন পর্যন্ত সে নিজেকে এর মধ্যে আবদ্ধ করে রাখবে, ততদিন পর্যন্ত তার পক্ষে পরম সত্যকে উপলব্ধি করা অথবা তাঁর মধ্যে বসবাস করা অসম্ভব হয়ে উঠবে।

প্রকৃতির মধ্যেকার প্রতিবন্ধকতাগুলি যেমনই হোক, তাদের সঙ্গে মোকাবিলা করবার প্রক্রিয়াটি যতই সুদীর্ঘ ও যন্ত্রণাদীর্ণ হোক না কেন পরম সত্যের বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত তারা দাঁড়াতে পারে না, যদি যথার্থ উদ্দীপনা, মনোভঙ্গী এবং প্রচেষ্টা সত্তার এই অংশগুলিতে উপস্থিত থাকে কিংবা সেখানে তাদের আগমন ঘটে। কিন্তু যদি কোন সাধক ভগবৎ জ্যোতির বিরুদ্ধে তার চোখকে বন্ধ করে রাখবার অথবা তার হৃদয়কে কঠিন করে তুলবার জন্য নিজের সম্বন্ধে ভাল ধারণা ও একগুঁয়েমির ভিতর থেকে অথবা তামসিক নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে থেকে অবিরামভাবে চলতে থাকে, তবে যতদিন পর্যন্ত সে তেমনভাবে চলে, ততদিন কেউই তাকে সাহায্য করতে পারে না। দিব্য পরিবর্তনের জন্য সত্তার সকল অংশের সম্মতি থাকাটি হল অপরিহার্য। আর সম্মতির পরিপূর্ণতা ও অখণ্ডতাই পূর্ণ সমর্পণকে গড়ে তোলে। কিন্তু নিম্নতর প্রাণের সম্মতিকে অবশ্যই কেবলমাত্র এক মানসিক প্রকাশ্য ঘোষণা অথবা এক ক্ষণস্থায়ী আবেগময় আনুগত্য হলে চলবে না। একে অবশ্যই নিজেকে এক স্থায়ী মনোভঙ্গী এবং এক অটল ও সঙ্গতিপূর্ণ কর্মের মধ্যে পরিবর্তিত করতে হবে।

এই যোগ একমাত্র তাদের পক্ষেই শেষ পর্যন্ত সাধন করা সম্ভবপর হতে পারে যারা এই পথের সম্পর্কে পূর্ণভাবে আন্তরিক, আর ভগবানের মাঝে নিজেদের আবিষ্কার

করবার জন্য যারা তাদের ক্ষুদ্রকায় মানবীয় অহং ও তার দাবিগুলিকে বিলোপ করবার ক্ষেত্রে প্রস্তুত হয়ে থাকে। একে কখনও এক চপলতা বা শিথিলতাপূর্ণ মনোভাবের বশবর্তী হয়ে সম্পাদন করা যায় না। কর্মটি বড় বেশী রকমের ঊর্ধ্বস্থিত ও সুকঠিন। সামান্য এতটুকু অনুমোদন অথবা ক্ষুদ্রতম কোন উন্মুক্তির থেকে সুবিধালাভ করবার জন্য নিম্নতর প্রকৃতির অন্তর্গত বিরুদ্ধ শক্তিগুলিও বড় বেশী তৎপর হয়ে থাকে। আর আস্পৃহা ও তপস্যারও অত্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন ও তীব্র হওয়ার প্রয়োজন হয়ে থাকে। যদি মানবীয় মনের ভাবনাগুলির মধ্যে এক ধরনের আত্মজাহিরের মনোভাব থাকে, অথবা বিভিন্ন দাবি ও সহজাত প্রবৃত্তিগুলির প্রতি ইচ্ছাকৃত প্রশ্রয় এবং সত্তার সর্বাপেক্ষা নিম্নতম অংশের মধ্যস্থিত ভান, যেগুলি সাধারণভাবে মানবীয় প্রকৃতি এই নামে সমর্থিত হয়ে থাকে, তা যদি উপস্থিত থাকে, তাহলে এই যোগ সাধন করা সম্ভব হবে না। যদি তুমি অজ্ঞানতার অন্তর্গত এই সমস্ত নিম্নতম বস্তুগুলিকে অথবা অন্ততপক্ষে এই পথে মেনে নেওয়ার পক্ষে যোগ্য কোন ক্ষুদ্রতর সত্যকে দিব্য সত্যের সঙ্গে একাত্ম করে তুলবার জন্য নাছোড়বান্দা হয়ে ওঠ তাহলেও এই যোগ করা যাবে না। যদি তুমি তোমার অতীতের তোমাকে ও তার পুরোনো মানসিক, প্রাণিক এবং শারীরগত রূপসমূহ আর অভ্যাসগুলিকে আঁকড়িয়ে জড়িয়ে থাক তাহলেও এই যোগ করা চলবে না। একজনকে নিরন্তরভাবে তার অতীতের সত্তাগুলিকে পিছনে ফেলে আসতে হবে। আর সর্বদা এক আরো আরো উচ্চতর সচেতন ভূমি থেকে দেখতে, কর্ম করতে এবং জীবনযাপন করতে হবে। এই যোগ সাধন করা সম্ভব হবে না যদি তুমি তোমার মানবীয় মন ও প্রাণিক অহং-এর ''স্বাধীনতার" জন্য জিদ ধরে বস। যদি একজন সাধারণ জীবনযাপনকেই মনোনীত করে, সেক্ষেত্রে মানব সত্তার সকল অংশগুলিই তাদের নিজস্ব অভ্যাসগত ধরনে, স্বীয় দায়িত্ব ও ঝুঁকির মধ্যে নিজেদের প্রকাশ ও পরিতৃপ্ত করবার জন্য অধিকারী হয়ে থাকে, তা সম্ভব হতে পারে যতদিন পর্যন্ত সে গতানুগতিক জীবনকেই অতিবাহিত করে। কিন্তু এমন এক যোগপথে প্রবেশ করা যার সমগ্র উদ্দেশ্যই হল এই সমস্ত মানবীয় বিষয়গুলিকে এক মহত্তর সত্যের বিধান ও শক্তির দ্বারা প্রতিস্থাপিত করে তোলা এবং যে পথে সাধনের আন্তরিক প্রণালীটি হল ভগবৎ শক্তির কাছে সমর্পিত হওয়া, সেখানে এ সত্ত্বেও এই তথাকথিত স্বাধীনতার জন্য দাবি জানিয়ে চলা, যে দাবি কিছু অজ্ঞানতাপূর্ণ বিশ্বজনীন শক্তির কাছে বশ্যতা স্বীকার করা ছাড়া বেশী কিছু নয়, তা হল এক অন্ধ বিরুদ্ধতার মধ্যে অবাধে নিজের সাধ মিটান, সেই সঙ্গে এক দ্বৈত জীবন যাপন করবার অধিকারকে দাবি করা।

যারা নিজেদের এই পথের সাধকরূপে প্রকাশ্যে ঘোষণা করে তারা যদি অজ্ঞানতার যে শক্তিগুলি এই যোগপথের মূলনীতি ও উদ্দেশ্যের বিরোধিতা করে, পথটিকে অস্বীকার ও উপহাস করে, সর্বদা অবিরামভাবে তাদেরই কেন্দ্রবিন্দু, যন্ত্র অথবা মুখপাত্ররূপে নিজেদের গড়ে তোলে, তাহলে সকলের মধ্যে খুব কম জনই এই যোগ

সম্পন্ন করতে পারবে। একদিকে রয়েছে অতিমানস উপলব্ধি, অতিমানসিক ভগবানের সব কিছুকে ছাপিয়ে যাওয়া ঔজ্জ্বল্য ও শক্তির অবতরণ, যা পৃথিবীর বুকে এখনও অবধি মূর্ত হয়ে ওঠা যে কোন কিছুর চাইতে অনেক বেশী মহত্তর এক পরম সত্যের আলো ও শক্তি, কাজেই এ হল ক্ষুদ্র মানবীয় মন ও তার যুক্তি যাকে একমাত্র স্থায়ী সত্য রূপে গণ্য করে থাকে তার বহু উর্ধ্বেকার জিনিস, যার প্রকৃতি, ধরন ও পৃথিবীতে তার বিকাশের পদ্ধতি হল এমন কিছু যাকে মানবীয় মন তার নিজস্ব অযোগ্য যন্ত্রের সাহায্যে কল্পনা করতে অথবা উপলব্ধি করতে কিংবা তার শিশুসুলভ মানদণ্ডের দ্বারা তার সম্বন্ধে কোন ধারণা করতেও সক্ষম হয় না। তবে সকল রকমের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও অতিমানস জড় চেতনা ও বস্তুগত জীবনের মাঝে প্রকাশিত হওয়ার জন্য প্রচণ্ডভাবে অগ্রসর হচ্ছে। অন্য দিকে রয়েছে এই নিম্নতর প্রাণ প্রকৃতি যার মধ্যে রয়েছে তার সমস্ত ভণ্ডামিপূর্ণ ঔদ্ধত্য, অজ্ঞানতা, অন্ধকারময়তা, অচেতনা বা অনধিকারী কোলাহলপূর্ণতা, যে তার নিজস্ব ভঙ্গীতে বিলম্ব করবার জন্য দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে দণ্ডায়মান হয়ে রয়েছে অবতরণের বিরুদ্ধে, এক অতিমানস অথবা অতিমানবীয় চেতনা ও সৃষ্টির কোন বাস্তব সত্য অথবা সত্যকার সম্ভাবনাকে বিশ্বাস করতে সে প্রত্যাখ্যান করে, কিংবা সে দাবি করে যে যদি অতিমানসের অস্তিত্ব থেকেও থাকে, তবুও তা আরো বেশী অসম্ভব, যা কিছু তাকে মিথ্যা বলে প্রমাণিত করতে চায় তাদের সকলকেই প্রলোভনের সঙ্গে দখল করে নেয় যাতে সে তার নিজস্ব ক্ষুদ্রাকার বিচারের মানদণ্ডের অনুরূপ হয়ে অবস্থান করতে পারে, ভগবানের উপস্থিতিকে অস্বীকার করে, — কেননা সে জানে যে ভগবৎ উপস্থিতি ব্যতিরেকে সমগ্র কর্মটিই অসম্ভব হয়ে উঠবে, — নিজস্ব চিন্তাবলী, বিচার, বাসনাসমূহ, প্রবৃত্তির সত্যতাকে জোরালোভাবে সমর্থন করে, আর যদি এ সমস্ত কিছুর বিরোধিতা করা হয়, তখন নিম্নতর প্রাণ সন্দেহ, অস্বীকার, মর্যাদাহানিকর সমালোচনা, বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলাকে ব্যাপকভাবে নিক্ষেপ করে নিজে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করে। এই দুটি জিনিসই বর্তমান উপস্থিত রয়েছে, যাদের মধ্য থেকে প্রত্যেককেই নির্বাচন করে নিতে হবে।

কেননা দিব্য সত্যের অবতরণের বিরুদ্ধে এই বাধাদান, এই নিস্ফলা প্রতিবন্ধকতা এবং অবরোধ কখনও চিরদিনের জন্য স্থায়ী হয়ে উঠতে পারে না। প্রত্যেককে অবশ্যই চূড়ান্তভাবে এক দিক কিংবা অন্যদিকটিতে এসে পৌঁছতে হবে, হয় পরম সত্যের পক্ষে অথবা তাঁর বিরুদ্ধে। অতিমানস উপলব্ধি কখনও নিম্নতর অজ্ঞানতার নাছোড়বান্দা মনোভাবের সঙ্গে সহাবস্থান করতে পারে না। তা এক দ্বৈত প্রকৃতির নিরন্তর তৃপ্তিসাধনের সঙ্গে একসঙ্গে বসবাস করতে বা কাজ করতে অক্ষম। (ক্রমশ)

উৎস: *Letters on Yoga* (Imp. 1988), Part Four, PP. 1308-1311,
অনুবাদ: দেবযানী সেনগুপ্ত

আধ্যাত্মিক ও অতিমানস রূপান্তর
শ্রীঅরবিন্দ

এসব একেবারে ঠিক। এই যোগের অভ্যাস দ্বিবিধ — একদিকে আছে চেতনার উচ্চতর স্তরে আরোহণ, অন্যদিকে উচ্চতর স্তরের শক্তির পৃথ্বী চেতনায় অবতরণ যাতে অন্ধকার ও অজ্ঞতার শক্তি বিদূরিত হয় এবং প্রকৃতির রূপান্তরসাধন হয়।

*

যেসব জড়বস্তুর মধ্যে রয়েছে প্রাণ আর সাথে সাথে মনোময় সত্তাও, তা হ'ল মানুষী সত্তা আর তার সকল চেতনাকে উর্ধ্বে আরোহণ করতে হবে যাতে উচ্চতর চেতনায় তারা উপনীত হয়; উচ্চতর চেতনাকেও মনে, প্রাণে ও জড়ে অবতরণ করতে হবে। ঐভাবে বাধার প্রাচীরগুলি অপসারিত হবে এবং উচ্চতর চেতনা সমগ্র নিম্ন প্রকৃতিতে ক্রিয়াশীল হতে সমর্থ হবে এবং তাকে অতিমানস শক্তির দ্বারা রূপান্তরিত করতে পারবে।

পৃথিবী হ'ল জড়জগতে বিবর্তনের একটি ক্ষেত্র। সেখানে পৃথ্বী চেতনায় মন ও প্রাণ, অতিমানস, সচ্চিদানন্দ একটি নীতিরূপে নিবর্তিত; কিন্তু প্রথমে কেবলমাত্র জড় সংগঠিত ছিল; তারপর সেখানে প্রাণজগৎ থেকে প্রাণ অবতরণ করে এবং জড়ের মধ্যে প্রাণের নীতিকে রূপ দেয় ও সংগঠিত করে এবং কাজ শুরু করে, উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর সৃষ্টি করে; তারপর মনোময় স্তর থেকে মন অবতরণ করে ও মানুষ সৃষ্টি করে। এখন অতিমানসকে অবতরণ করতে হবে যাতে অতিমানস জাতির সৃষ্টি হয়।

*

সাধনার ভিত্তি হ'ল নিম্নপ্রকৃতির রূপান্তরের উপায় হিসাবে উচ্চতর স্তরগুলি হ'তে শক্তিরাজির অবতরণ ও উচ্চতর স্তরগুলিতে নিম্নচেতনার আরোহণ, যদিও স্বভাবতঃই তা সময়সাপেক্ষ এবং পূর্ণরূপান্তর কেবলমাত্র অতিমানসের অবতরণের দ্বারা ঘটতে পারে।

*

এই সকল বিষয়ে কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। অনেকের ক্ষেত্রে প্রথমে অবতরণ দেখা যায় এবং আরোহণ পরে, আবার অন্যদের ক্ষেত্রে এর বিপরীত; কারুর ক্ষেত্রে দুটি একত্রে ঘটতে থাকে। যদি উর্ধ্বে স্থিরভাবে অধিষ্ঠিত হতে পারা যায় তা আরও ভাল। আমি তোমাকে বুঝিয়ে বলেছি তা কেন ঘটেনি।

*

আমি কেবল উর্ধ্বে উঠার কথা বলছিনা। উর্ধ্বে উঠার পরে সত্তার বিভিন্ন অংশে যেন উচ্চতর চেতনার অবতরণ ঘটে। এর সঙ্গে চৈত্যের বিকাশ সহায়করূপে থাকবে এবং

তার এই সহায় বহির্প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটাবে।

*

হ্যাঁ, নামিয়ে আনার থেকে আরোহণ সহজ; উচ্চতর চেতনা শরীরে, মনে ও প্রাণে জড়িয়ে পড়ে ও বাধাপ্রাপ্ত হয়।

*

শারীর চেতনায় অবতরণ সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সূক্ষ্ম শারীর চেতনার কোন কিছু সব সময়েই উঠতে পারে — কিন্তু বাইরের শারীর চেতনা একমাত্র তখনই তা করতে পারবে যখন ঊর্ধ্ব থেকে শক্তি নেমে এসে তাকে ভরিয়ে দিতে পারবে। তাহলে তখন উভয়ে একপ্রকারের একত্ব লাভ করে, যেক্ষেত্রে উচ্চতর চেতনাটি ও শারীর চেতনা এক অখণ্ড চেতনা হ'য়ে যায় এবং নিম্ন থেকে শক্তিগুলি ঊর্ধ্বে উঠে এবং ঊর্ধ্ব থেকে অবতরণ ঘটে, যুগপৎ এবং পরপর পরস্পরে মিশে যায়।

*

ঊর্ধ্বে উঠার গতি ও নীরবতা পরম সত্যের প্রকাশের জন্য অপরিহার্য।

*

আরোহণ বা ঊর্ধ্বের দিকে গতি আসে যখন সত্তায় যথেষ্ট আস্পৃহা থাকে অর্থাৎ বিভিন্ন মানসিক, প্রাণিক ও শারীর স্তরের আস্পৃহা। আবার এদের প্রতিটি মনের ঊর্ধ্বের সেই স্তরে উঠে যায় যেখানে তাদের প্রত্যেকে অতিমানসে পৌঁছায় এবং সে তার সকল গতিবিধি ঊর্ধ্বে তাদের উৎস থেকে লাভ করে। উচ্চতর স্তর তখনই অবতরণ করে যখন একটি প্রশান্ত গ্রহিষ্ণুভাবযুক্ত তোমার সত্তার বিভিন্ন স্তর তা গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত। দুটি ক্ষেত্রেই যখন ঊর্ধ্বে উঠার জন্য আস্পৃহা আসে বা নিষ্ক্রিয় থেকে উচ্চতর শক্তিগুলিকে গ্রহণ করতে উন্মুক্ত হয়, তখন সত্তার বিভিন্ন অংশে সম্পূর্ণ প্রশান্ত থাকা সঠিক পরিস্থিতি।

যদি তোমার শান্তভাবে আস্পৃহার বা সঙ্কল্পের প্রয়োজনীয় শক্তি না থাকে এবং তুমি দেখ যে তোমার ঊর্ধ্বে উঠার জন্য খানিকটা প্রচেষ্টার প্রয়োজন, তবে সাময়িক উপায় হিসাবে প্রচেষ্টা করে যেতে পার যতদিন না একটি স্বাভাবিক উন্মীলন আসে যে ক্ষেত্রে একটি নীরব আহ্বান বা একটি সহজ অনায়াস ইচ্ছাশক্তি উচ্চতর শক্তিগুলিকে কার্যকর করার জন্য যথেষ্ট।

*

সাধনায় আধারের সবকিছুর কোনও সময়ে ঊর্ধ্বে উঠে — তার উৎসের সঙ্গে যুক্ত হ'তে চাওয়ার প্রবণতা থাকে।

*

আধার হ'ল তা যার মধ্যে বর্তমানে চেতনা বিধৃত — মন-প্রাণ-শরীর।

*

একটি উচ্চতর স্তরে অবস্থান এবং সেখান থেকে শারীর স্তরের ক্রিয়াগুলি পৃথক কিছু বলে পর্যবেক্ষণ করা রূপান্তরের দিকে অগ্রসরের একটি সুনির্দিষ্ট পর্যায়।

*

সাধনার লক্ষ্যটি হ'ল চেতনা শরীর থেকে উঠে আসার এবং উপরে অধিষ্ঠিত হবে — সর্বত্র প্রসারিত হ'য়ে বিস্তার করবে, কেবল শরীরে সীমিত থাকবে না। এইভাবে মুক্ত হ'য়ে গিয়ে, যা কিছু এই অধিষ্ঠানের ঊর্ধ্বে, সাধারণ মনের ঊর্ধ্বে রয়েছে তাদের প্রতি উন্মীলিত হবে, ঊর্ধ্ব থেকে যা সব নেমে আসে সেখানে তাদের গ্রহণ করবে এবং যা কিছু নিম্নে আছে তাদের পর্যবেক্ষণ করবে। এইভাবে যা কিছু নিম্নে আছে সব পরিপূর্ণ স্বাধীনতার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করা ও নিয়ন্ত্রণ করা এবং যা কিছু অবতরণ করে এবং শরীরের মধ্যে ভিড় ক'রে আসে তাদের গ্রহণ করতে বা তাদের প্রবাহের একটি পথ তৈরী করতে পারা সম্ভব এবং তা শরীরকে ঊর্ধ্বের চেতনার প্রকাশের যন্ত্র হ'তে এবং একটি উচ্চতর চেতনায় ও প্রকৃতিতে পুনর্গঠিত হতে প্রস্তুত করবে।

তোমার মধ্যে যা ঘটছে তা হ'ল এই যে চেতনা এই মুক্তির মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করছে। যখন কেউ সেখানে উচ্চতর অধিষ্ঠানটিতে থাকে, তখন সে লাভ করে পরমাত্মার মুক্তি এবং সুবিশাল নীরবতা ও চিরন্তন শান্তভাব — তবে এই শান্তভাবকে শরীরেও নামিয়ে আনতে হবে, নিম্নের সকল স্তরে এবং সেখানে নিজেকে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যেন কোনকিছু পিছনে দণ্ডায়মান রয়েছে ও সকল গতিবিধিকে ধারণ ক'রে আছে।

*

তোমার মধ্যে কিছু একটা উচ্চতর চেতনা সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে এবং ঊর্ধ্বের সেখানে গিয়েছে — মস্তকের উপরে যেখানে সাধারণ চেতনা ও উচ্চতর স্তরগুলি মিলিত হয়। এটিকে বিকশিত করতে হবে যতদিন না চেতনার সমস্ত উৎস সেইখানে যায় এবং অন্য সব কিছু সেখান থেকে চালনা করে — এর সঙ্গে একই সাথে থাকবে চৈত্যের মুক্তি যাতে তা মন, প্রাণ ও শরীরের অংশগুলিতে ঊর্ধ্বের ক্রিয়ার সহায়ক হ'তে পারে।

এ হ'ল পরম আত্মন্, মনের ঊর্ধ্বের আধ্যাত্মিক সত্তা — এর প্রথম অভিজ্ঞতা হ'ল এমন একটি নীরবতা ও স্থিরতা (যা পরে অসীম ও চিরস্থায়ী বলে অনুভূত হয়) যেখানে মন, প্রাণ ও শরীরের ক্রিয়াবলীর কোন স্পর্শ থাকে না। উচ্চতর চেতনা সর্বদাই আত্মন্-এর সংযোগে থেকে বাস করে —অজ্ঞতার কার্যাবলীর দরুন নিম্নচেতনা এর থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে।

*

যদি তোমার চেতনা মস্তকের উপরে উঠে, তার অর্থ তা সাধারণ মনকে অতিক্রম করে ঊর্ধ্বের এমন স্থলে চলে গিয়েছে যা উচ্চতর চেতনা গ্রহণ করে অথবা চলে গিয়েছে

উচ্চতর চেতনার ঊর্ধ্বের স্তরগুলির দিকে। প্রথম ফল হ'ল পরম আত্মন্-এর নীরবতা ও শান্তি যেগুলি উচ্চতর চেতনার ভিত্তিস্বরূপ; পরে এগুলি নিম্নের স্তরগুলিতে অবতরণ করতে পারে, একেবারে শরীর পর্যন্ত। আলোকও নামতে পারে এবং শক্তিও। নাভি ও তার নীচের চক্রগুলি যা কিনা প্রাণ ও শারীর চেতনার অন্তর্গত; হয়ত সেখানে উচ্চতর শক্তির কোন কিছু নেমে এসেছে। (ক্রমশ)

উৎস: ***Letters on Yoga* (Imp. 1988), Part Four, PP. 1126-1129,**
অনুবাদ: মনোজ ভট্টাচার্য

চৈত্যপুরুষের সবচেয়ে অন্তরঙ্গ স্বভাব হল পবিত্র প্রেম, আনন্দ ও একত্বের মাধ্যমে ভগবানের দিকে তার প্রেষণা।

শ্রীঅরবিন্দ

... চৈত্যপুরুষের সব চেয়ে অন্তরঙ্গ স্বভাব হল পবিত্র প্রেম, আনন্দ ও একত্বের মাধ্যমে ভগবানের দিকে তার প্রেষণা। দিব্য প্রেমই তার পরম সাধ্য, ভগবৎপ্রেমই তার প্রেরণাশক্তি, তার চরম লক্ষ্য, আমাদের মধ্যে জাত-প্রায় দেবতার জ্যোতির্ময় গুহার উপর বা নবজাত দেবতার এখনো তমসাচ্ছন্ন শয্যার উপর দীপ্তিমান সত্যের তারকা। তার উপচয় ও অপরিণত জীবনের প্রাথমিক দীর্ঘ পর্বে এ নির্ভর করে পার্থিব ভালোবাসা, স্নেহ, কোমলতা, শুভেচ্ছা, করুণা, বদান্যতার উপর, সকল প্রকার সৌন্দর্য ও নম্রতা ও চারুতা ও আলোক ও বীর্য ও শৌর্যের উপর এবং মানুষী প্রকৃতির স্থূলতা ও তুচ্ছতাকে মার্জিত ও শুদ্ধ করার কাজে যা সব সহায়কর তাদের উপর; কিন্তু এ জানে যে এই সব মানুষী গতিবৃত্তি উৎকৃষ্ট অবস্থাতেও কত মিশ্রিত, এবং নিকৃষ্ট অবস্থাতে কত অধঃপতিত, আর অহং ও আত্মপ্রতারক কোমলভাবাপন্ন মিথ্যা এবং অন্তঃপুরুষের গতিবৃত্তির অনুকরণে লাভবান অবর আত্মার ছাপে কত দূষিত। আত্মপ্রকাশ ক'রেই এ উদ্যত ও উৎসুক হয় পুরনো সকল বন্ধন, অপূর্ণ সকল ভাবপ্রবণ কর্মসূত্র ছিন্ন করতে এবং তাদের স্থলে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রেম ও একত্বের মহত্তর অধ্যাত্ম সত্য। তখনো এ মানুষী বিভিন্ন রূপ ও গতিবৃত্তিকে স্থান দিতে পারে কিন্তু এই সর্তে যে তারা ফিরবে একমাত্র পরম একের দিকে। এ স্বীকার করে শুধু সেই সব বন্ধন যেগুলি সহায়কর, গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা, ভগবৎ-অন্বেষুদের সঙ্ঘ, অজ্ঞানাচ্ছন্ন মানব ও পশু জগৎ ও তার জীবকুলের উপর অধ্যাত্ম করুণা, সর্বত্র ভগবানের উপলব্ধিজাত সুখ ও হর্ষ এবং সৌন্দর্যের তৃপ্তি। এ প্রকৃতিকে ডুবিয়ে দেয় ভিতর দিকে অন্তঃস্থ ভগবানের সঙ্গে হৃদয়ের গূঢ় কেন্দ্রে মিলনের অভিমুখে, আর যতক্ষণ সেই আহ্বান

থাকে, অহন্তার কোন অপবাদে, পরার্থপরতা বা কর্তব্য বা মানবপ্রীতি ও সেবার কোন বাইরের ডাকে সে ভুলবে না বা তার পবিত্র আকূতি এবং অন্তঃস্থ পরম দেবতার আকর্ষণে তার যে যাত্রা শুরু হয়েছিল তা থেকে ফিরবে না। সে সত্তাকে ঊর্ধ্বে তোলে বিশ্বাতীত পরম উল্লাসের দিকে, এবং অদ্বয় সর্বোত্তমের দিকে উৎসর্পণে জগতের সব নিম্নাভিমুখী আকর্ষণ তার পক্ষ থেকে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হয়; কিন্তু সে এই বিশ্বাতীত প্রেম ও পরমানন্দকে নিম্নেও আহ্বান করে এই উদ্দেশ্যে যে তা যেন এই জগৎকে — ঘৃণা ও বিরোধ ও বিভেদ ও তমসা ও দ্বন্দ্বাকীর্ণ অবিদ্যার এই জগৎকে মুক্ত ও রূপান্তরিত করে। সে নিজেকে খুলে ধরে এক বিশ্বজনীন দিব্য প্রেম, অগাধ করুণা, এক তীব্র ও বিশাল সঙ্কল্পের নিকট — সকলের মঙ্গলের জন্য, সেই জগন্মাতার আলিঙ্গনের জন্য যিনি তাঁর সন্তানদের ঢেকে আছেন বা নিজের কাছে একত্র করছেন, — ইনিই সেই দিব্য অনুরাগ যা রাত্রির মধ্যে নেমে এসেছে জগৎকে সর্বব্যাপী অবিদ্যা থেকে উদ্ধার করার জন্য। অস্তিত্বের এই যে সব গভীরে অধিষ্ঠিত মহৎ সত্য তাদের মানসিক অনুকরণে বা কোন প্রাণিক অপব্যবহারে সে আকৃষ্ট হয় না বা বিপথে চলে না; এই সবকে সে খুঁজে বাইরে প্রকাশ করে তার সন্ধানী আলোকরশ্মির সাহায্যে এবং দিব্য প্রেমের সমগ্র সত্যকে আবাহন ক'রে নিচে নামিয়ে আনে এই সব হীন গঠনের নিরাময়ের জন্যে, মানসিক, প্রাণিক ও শারীরিক প্রেমকে তাদের অপ্রচুরতা বা বিকৃতি থেকে মুক্ত করার জন্য এবং অন্তরঙ্গতা ও একত্ব ও আরোহ উল্লাস ও অবরোহ হর্ষাবেশের মধ্যে তাদের সুপ্রচুর অংশ প্রকাশ করার জন্য।

প্রেমের ও প্রেম কর্মের সকল খাঁটি সত্যই চৈত্যপুরুষ স্বীকার করে তাদের স্থানে; কিন্তু এর শিখা সর্বদাই ঊর্ধ্ব পানে উঠতে থাকে আর এই উৎক্রান্তিকে সত্যের নিম্নতর পর্যায় থেকে উচ্চতর পর্যায়ে নিয়ে যাবার জন্য এ উৎসুক, কারণ সে জানে যে একমাত্র কোন শ্রেষ্ঠ সত্যে আরোহণের এবং সেই শ্রেষ্ঠ সত্যের অবতরণের দ্বারাই প্রেমকে ক্রুশ থেকে মুক্ত ক'রে অধিষ্ঠিত করা যায় রাজাসনে; এই ক্রুশ এক বিশ্ববিকৃতির তির্যক রেখার দ্বারা নিবারিত ও দূষিত দিব্য অবতরণের নিদর্শন, আর এই বিশ্ববিকৃতি জীবনকে পরিণত করে কষ্টভোগ ও দুর্ভাগ্যের অবস্থায়। একমাত্র পরম আদি সত্যে উত্তরণের দ্বারাই এই বিকৃতির নিরাময় সম্ভব আর কেবল তখনই প্রেমের সকল কর্ম এবং জ্ঞানের ও প্রাণেরও সকল কর্ম দিব্য তাৎপর্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়ে পরিণত হতে পারে এক অখণ্ড আধ্যাত্মিক জীবনের অংশে।

উৎস: ***The Ascent of the Sacrifice — 1*, অনুবাদ: শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়**

দুজনের চেতনার ঐক্য
শ্রীঅরবিন্দ

চেতনার ঐক্য ও পথ

মায়ের চেতনা ও আমার চেতনা যে বিপরীত এটা হলো গোড়ার দিকে যারা ছিল তাদের আবিষ্কার, যখন মাকে তারা সম্পূর্ণ চিনতে বা গ্রহণ করতে পারেনি। কিন্তু চেনবার পরেও তারা এমনি নিরর্থক বিরুদ্ধতা ক'রে নিজেদের এবং অন্যেদের যথেষ্ট ক্ষতি করেছে। মায়ের ও আমার চেতনা একই জিনিস, একই দিব্যচেতনা দুই অংশে বিভক্ত, বর্তমান লীলার প্রয়োজনে। মায়ের জানা ও তাঁর শক্তি ছাড়া কোনো কিছুই করা যাবে না। যে কেউ মায়ের চেতনাকে অনুভব করবে সে জানবে যে আমি আছি তার পিছনে, আর আমার চেতনাকে যে অনুভব করবে সে জানবে যে মা আছেন তার পিছনে। কিন্তু যদি ঐভাবে ভাগ ক'রে দেখা হয় (যাদের মন ঐ ভাব নিয়েছিল তাদের কথা বাদ দিয়ে) তাহলে সত্যের প্রতিষ্ঠা কেমন ক'রে হবে — কারণ সত্যের মধ্যে তেমন পার্থক্য নেই। ১৩-১১-১৯৩৪

*

মায়ের চেতনা হলো দিব্যচেতনা, তার থেকে যে আলো আসে তা দিব্যসত্যের আলো। যে তাকে গ্রহণ করবে সে মায়ের আলোর মধ্যে অবস্থান করবে, মন প্রাণ ও দেহের সকল স্তরেই সে সত্যকে দেখবে। যা কিছু অদিব্য তাকে সে প্রত্যাখ্যান করবে — অদিব্য হলো যা মিথ্যা, যা অজ্ঞানতা, তামসিক শক্তিদের ভ্রান্তি; যা কিছু অন্ধকার অস্পষ্ট এবং দিব্যসত্যকে ও তার আলো এবং শক্তিকে মানতে নারাজ তা সবই অদিব্য। সুতরাং মায়ের আলোকে ও শক্তিকে যা মানে না তাও অদিব্য। সেইজন্যই তোমাকে সর্বদা বলি মায়ের সঙ্গে এবং তাঁর আলো ও শক্তির সঙ্গে সংস্পর্শ রাখতে, তাহলে তুমি এই সব ধাঁধা ও অনিশ্চয়তার হাত থেকে বেরিয়ে উপরের সত্যকে গ্রহণ করতে সক্ষম হবে।

মায়ের আলো বা আমার আলোর কথা যখন বিশেষ অর্থে বলা হয়, তার মানে তা বিশেষ একরূপ গুহ্য ক্রিয়া — যে আলো অতিমানস থেকে আসে তার ক্রিয়া। তার মধ্যে শ্বেতশুভ্র আলোটি মায়ের, যা করে বিশুদ্ধীকৃত, উদ্দীপিত, সত্যের শক্তিকে নামিয়ে এনে যা রূপান্তর আসা সম্ভব করে। কিন্তু বস্তুত উচ্চ দিব্যসত্যের সব আলোই মায়ের আলো।

মায়ের পথ ও আমার পথে কোনো প্রভেদ নেই; চিরদিন আমরা একই পথে চলেছি, যে পথ অতিমানস রূপান্তর ও ভগবৎ উপলব্ধির অভিমুখে; কেবল শেষকালেই নয়, কিন্তু প্রথম শুরু থেকেই আমাদের ঐ একই পথ।

মাকে একদিকে আর আমাকে অন্যদিকে বিপরীত ও পৃথক ক'রে নিয়ে এই যে দুই বিরুদ্ধ ভাগে ভাগ ক'রে নেবার প্রচেষ্টা, এ হলো মিথ্যা জগতের শক্তিদের চক্রান্ত, তারা চায় যে কোনো সাধক যেন সত্যে পৌঁছতে না পারে। এই সকল মিথ্যাকে তোমার মন থেকে একেবারে দূর ক'রে দাও।

এই কথা নিশ্চিত জেনে রাখো যে মায়ের আলো এবং শক্তি হলো সত্যেরই আলো এবং শক্তি; মায়ের সেই আলো এবং শক্তির সঙ্গে নিত্য সংযোগ রক্ষা করো, তবেই তুমি দিব্যসত্যের মধ্যে উন্নীত হতে পারবে। ১০-৯-১৯৩১

*

যা কিছু পাবে মায়ের কাছ থেকে, জানবে যে তা আমার কাছ থেকেও আসছে — কোনো তফাৎ নেই। তেমনি আমি যদি কিছু দিই, তাও জানবে যে মায়ের শক্তিতে সাধকের কাছে গিয়ে পৌঁছচ্চে। ২০-৮-১৯৩৬

*

তুমি মনে করো যে মায়ের দ্বারা তোমার কোনো সাহায্য হবে না ... কিন্তু তাঁর সাহায্যে তোমার যদি কিছু লাভ না হয় তাহলে আমার সাহায্যে তার চেয়েও কম হবে। সে যাই হোক, আমি সকল সাধকদের জন্য যে ব্যবস্থা করেছি তার কোনো রদবদল হতে পারে না, বিনা ব্যতিক্রমে সকলকেই আমার পরিবর্তে মায়েরই কাছ থেকে আলো এবং শক্তি নিয়ে আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে মায়েরই দ্বারা পরিচালিত হতে হবে। এ ব্যবস্থা কেবল সাময়িক উদ্দেশ্যে নয়, সাধক যদি নিজেকে খুলে ধরে গ্রহিষ্ণু হয় তাহলে এই হলো একমাত্র সত্য এবং সার্থক উপায় (কারণ সেই রকমই মায়ের উপস্থিতি ও তাঁর শক্তি)।

*

মা এবং আমি একই শক্তির দুই রূপ — যা স্বপ্নে দেখেছ তা খুবই যুক্তিসঙ্গত। ঈশ্বর-শক্তি, পুরুষ-প্রকৃতি, এ হলো একই ব্রহ্মের দুই দিকের বিকাশ। ১৯৩৩

*

দুটি মূর্তি মিলে এক হয়ে গেল, এই যে অনুভূতি, অর্থাৎ আমি ও মা এক এবং অভিন্ন, এটি খুবই সাধারণ সত্য অনুভূতি। ৪-১১-১৯৩৫

(ক্রমশ)

উৎস: *On Himself*, অনুবাদ: পশুপতি ভট্টাচার্য

যোগপথের বাধাবিঘ্ন

শ্রীঅরবিন্দ

যারাই আধ্যাত্মিক পথে প্রবেশ করে, তাদের সকলকেই যোগপথের বাধাবিঘ্ন ও অগ্নিপরীক্ষার মুখোমুখী হতে হয়, যে সমস্ত প্রতিবন্ধকতাগুলি তাদের নিজস্ব প্রকৃতির মধ্য থেকে জাগ্রত হয়ে ওঠে এবং কিছু বাইরের থেকে এসে তাদের মধ্যে প্রবেশ করে। প্রকৃতির মধ্যেকার এই বাধাবিঘ্নগুলি সর্বদা বারংবার জেগে ওঠে যতদিন পর্যন্ত না তুমি তাদের পরাজিত করতে পারছ। অবশ্যই শক্তিমত্তা ও ধৈর্য উভয়ের সঙ্গেই এদের মুখোমুখী হতে হবে। কিন্তু অগ্নিপরীক্ষা ও বাধাবিঘ্নগুলি জাগ্রত হয়ে উঠলে প্রাণের অংশটি বিষণ্নতাপ্রবণ হয়ে পড়ে। এটি তোমার ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক কিছু নয় বরং সকল সাধকদের ক্ষেত্রেই এসবের আগমন ঘটে থাকে। এর অর্থ সাধনার ক্ষেত্রে এক অসামর্থ্য অথবা কোন অসহায়তার বোধকে সত্য বলে প্রমাণ করা নয়। কিন্তু এই বিষণ্নতার প্রতিক্রিয়াকে অতিক্রম করবার জন্য, মায়ের শক্তি যাতে তোমাকে সহায়তা করে তার জন্য সেই শক্তিকে আহ্বান করে, তুমি অবশ্যই নিজেকে অনুশীলনের মধ্য দিয়ে উপযুক্ত করে তুলবে।

যারা নিজেকে যোগপথটির দিকে অটলভাবে বিচ্ছিন্ন করে তোলে, তারা তাদের আধ্যাত্মিক নিয়তির বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারে। আর যদি কেউ সেই স্থানটিতে পৌঁছতে ব্যর্থ হয়ে থাকে, তাহলে তা কেবলমাত্র দুটি কারণের মধ্যে যে কোন একটির জন্য হতে পারে। হয় তারা পথটিকে পরিত্যাগ করে কিংবা উচ্চাকাঙ্ক্ষা, দম্ভ, বাসনা প্রভৃতির জন্য কোন প্রলোভনের কারণে তারা ভগবানের প্রতি আন্তরিক নির্ভরতার অবস্থা থেকে বিপথে চলে যায়।

*

সাধারণভাবে একথা বলা যেতে পারে যে সাধনার পথে কাউকে বিশেষ করে খুবই অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েদের আকর্ষণ করে আনবার জন্য অতিরিক্ত ব্যগ্র হয়ে ওঠা বিচক্ষণতার পরিচায়ক নয়। এই যোগপথে যে সাধক প্রবেশ করবে তার মধ্যে অবশ্যই এক সত্যকার আহ্বানের উপস্থিতি থাকবে। আর এমনকি প্রকৃত আহ্বান থাকা সত্ত্বেও এই পথ প্রায়শই যথেষ্ট পরিমাণে কঠিন হয়ে থাকে। কিন্তু যখন একজন এক উৎসাহী স্বীয় মত প্রচারের আগ্রহে পূর্ণ মনোভাবের থেকে লোকেদের নিজের দিকে টেনে আনে, সেক্ষেত্রে বিপদ হল যথার্থ অগ্নির পরিবর্তে এক কৃত্রিম ও অসত্য অগ্নিশিখাকে প্রজ্বলিত করে তোলা অথবা এক ক্ষণস্থায়ী অগ্নিকে জ্বালিয়ে তোলা যা স্থায়ী হয়ে উঠতে পারেনা, আর প্রাণিক তরঙ্গের তীব্র উচ্ছ্বাসের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। বিশেষভাবে এই জিনিস তরুণদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যারা নমনীয় এবং বিভিন্ন ভাবনা

ও যোগাযোগকারী অনুভূতিসমূহকে আঁকড়িয়ে ধরে, যেগুলি তাদের মধ্যেকার নিজস্ব কিছু নয়। পরবর্তীকালে প্রাণ তার অতৃপ্ত দাবীগুলিকে নিয়ে জেগে ওঠে। আর তারা দুটি বিরুদ্ধ শক্তির মাঝখানে পড়ে আন্দোলিত হতে থাকে। অথবা সাধারণ জীবন ও তার কর্ম এবং বাসনা পরিতৃপ্তির শক্তিশালী আকর্ষণের কাছে খুব দ্রুত আত্মসমর্পণ করে, যা বয়ঃসন্ধিকালের স্বাভাবিক ঝোঁক। কিংবা অনুপযুক্ত আধারটি যার জন্য প্রস্তুত ছিলনা বা অন্ততপক্ষে তখনো পর্যন্ত তৈরী হয়ে ওঠেনি, এমন এক আহ্বানের কঠিন চাপের অধীনস্ত হয়ে কষ্টভোগ করে। কিন্তু যখন একজন নিজের মধ্যে সত্যকার কিছুকে লাভ করে, তখন সে সবকিছুর মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে এবং অবশেষে সাধনার পরিপূর্ণ পথটিকে গ্রহণ করে। কিন্তু কেবলমাত্র কম সংখ্যক মানুষই এভাবে অগ্রসর হতে পারে। যে সমস্ত লোকেরা নিজেরাই এগিয়ে আসে এবং তাদের মধ্যে একমাত্র যাদের মধ্যস্থিত আহ্বানটি আন্তরিকভাবে তাদের নিজস্ব জিনিস এবং তা অটল কেবলমাত্র তাদের গ্রহণ করাই বেশী ভাল।

*

অমনভাবে কষ্টভোগ করবার মধ্যে কোন অপরিবর্তনীয় কারণ নেই। যা কষ্টভোগ করে তা অন্তরাত্মা নয়; পুরুষ সকল বিষয়ের প্রতি শান্ত ও সমতাপূর্ণ, আর চৈত্যসত্তার একমাত্র বেদনা হল ভগবৎ সঙ্কল্পের প্রতি পরাপ্রকৃতির প্রতিরোধের দরুন সৃষ্ট যে বেদনা অথবা পরম সত্য, শ্রেষ্ঠ এবং সুন্দরের আহ্বানের প্রতি সকল কিছুর ও মানুষের প্রতিরোধের কারণে উদ্ভূত বেদনা। কষ্টভোগ করবার দরুন যা কিছু আক্রান্ত হয় তা হল প্রাণিক প্রকৃতি ও দেহ। যখন অন্তরাত্মা ভগবানের দিকে আকর্ষণ করে, সেক্ষেত্রে মনের মাঝে একটি প্রতিরোধ গড়ে উঠতে পারে যার সাধারণ রূপ হল অস্বীকার ও সন্দেহ প্রকাশ করা — যার ফলস্বরূপ মানসিক ও প্রাণিক কষ্টের সৃষ্টি হতে পারে। আবার প্রাণিক প্রকৃতির মাঝে এক ধরনের প্রতিরোধ আসতে পারে যার প্রধান লক্ষণ হল বাসনা এবং বাসনার বস্তুর প্রতি আসক্তি। যদি এই ক্ষেত্রে অন্তরাত্মা ও প্রাণিক প্রকৃতি, ভগবৎ আকর্ষণ এবং অজ্ঞানতার টানের মধ্যে কোন বিরোধ থাকে, তাহলে স্পষ্টতঃই মন এবং সত্তার প্রাণিক অংশগুলির অনেক কষ্টভোগ ঘটতে পারে। শারীর চেতনাও এক প্রতিরোধের সৃষ্টি করতে পারে যাকে সাধারণভাবে বলা যায় এক মূলগত নিষ্ক্রিয়তা, দেহগত চেতনার প্রকৃত উপাদানের মধ্যেকার এক অন্ধকার, উপলব্ধির বা বোধের এক অভাব, ঊর্ধ্বতর চেতনার প্রতি সাড়া দেবার ক্ষেত্রে এক অসামর্থ্য, যখন দেহগত চেতনা তেমনভাবে সাড়া দিতে চায় না এমনকি তখনও পর্যন্ত নিম্নতর চেতনার দিকে যন্ত্রবৎ অসহায়ের মত সাড়া দেওয়ার এক অভ্যাস। এ সমস্তের পরিণাম হতে পারে প্রাণিক ও দেহগত কষ্টভোগ। এইসব প্রতিরোধকে ছাড়িয়ে রয়েছে বিশ্বজনীন প্রকৃতির মধ্যেকার প্রতিরোধ, যে প্রকৃতি চায় না কোন সত্তা অজ্ঞানতা থেকে আলোর

মাঝে মুক্তিলাভ করুক। এই প্রতিরোধ পুরাতন গতিবৃত্তিগুলির ধারাবাহিকতার মধ্যে এক উগ্র জেদের রূপ গ্রহণ করতে পারে। সেই সমস্ত গতিবৃত্তিগুলির তরঙ্গমালা মন, প্রাণ ও দেহের উপর নিক্ষিপ্ত হয়, যার ফলে অতীতের বিভিন্ন ভাবনা, প্রবৃত্তিসমূহ, বাসনাবলী, অনুভূতিরাজি, প্রতিক্রিয়াসমূহ নিরবচ্ছিন্ন রূপে আসতে থাকে, এমনকি তাদের ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া এবং প্রত্যাখ্যান করবার পরেও। তারা বাইরে থেকে এক আক্রমণোদ্যত সৈন্যদলের মত আবার ফিরে আসতে পারে। আর তা হতে পারে যতদিন পর্যন্ত না সমগ্র প্রকৃতি, যাকে ভগবানের কাছে অর্পণ করা হয়েছে, তা গতিবৃত্তিগুলির প্রবেশকে প্রত্যাখ্যান করে। এ হল বিশ্বজনীন প্রতিরোধের আন্তরিক রূপ। কিন্তু তা এক বাহ্য রূপও গ্রহণ করতে পারে। অর্থাৎ বিরোধিতা, অপবাদ, আক্রমণ, নিগ্রহ, নানা দুর্ভাগ্য, বিরুদ্ধ অবস্থাবলী এবং পারিপার্শ্বিকতা, যন্ত্রণা, অসুস্থতা, বিভিন্ন মানুষ অথবা শক্তিসমূহের দ্বারা আক্রান্ত হওয়া। এই সমস্ত কিছুর সম্মুখীন হবার জন্য দুটি পথ রয়েছে। প্রথমটি হল আত্মার পথ, যে পথ হল স্থিরতা, সমতাপূর্ণ, এমন এক মনোভঙ্গী, এক সঙ্কল্প, এমন এক মন, এক প্রাণ, এক শারীর চেতনা যা অটলভাবে ভগবৎ অভিমুখী হয়েছে আর সন্দেহ, বাসনা, আসক্তি, বিষণ্ণতা, দুঃখ, যন্ত্রণা, নিষ্ক্রিয়তার সকল অভিভাবনের দ্বারা যা অবিকম্পিত। এ জিনিস সম্ভব হতে পারে যখন আন্তর সত্তা জাগ্রত হয়ে ওঠে, যখন একজন আত্মা সম্বন্ধে, আন্তর মন, আন্তর প্রাণ, আন্তরদেহ সম্বন্ধে সচেতন হয়, কেননা সে তখন ভগবৎ ইচ্ছার সঙ্গে আরও সহজে নিজের সমন্বয় সাধন করতে পারে। তখন সত্তার মাঝে এমন এক বিভাজনের সৃষ্টি হয়, যেন সেখানে দুটি সত্তা অবস্থান করছে। একটি সত্তা রয়েছে অন্তরের গভীরে, শান্ত, শক্তিশালী, সমতাপূর্ণ, অবিচলিত, ভগবৎ চেতনা ও শক্তির এক প্রবাহ। আর সত্তার অন্য অংশটি রয়েছে বাইরে, যা নিম্নতর চেতনার দ্বারা তখনও পর্যন্ত বলপূর্বক দখলীকৃত অবস্থায় রয়েছে। কিন্তু তখন শেষোক্ত বিশৃঙ্খলাগুলি উপরভাসা ধরনের কিছুতে পরিণত হয় যেগুলি এক বাহ্য ক্ষুদ্রাকৃতি তরঙ্গ বিনা বেশী কিছু হয়ে উঠতে পারে না — এই ভাবে চলতে থাকে যতদিন পর্যন্ত না আন্তর চাপের প্রভাবে এই সমস্ত প্রতিবন্ধকতাগুলি অস্পষ্ট হয়ে আসে এবং অবশেষে সেগুলি একেবারে নিঃশেষিত হয়ে যায়। তখন বাহ্য সত্তাও হয়ে ওঠে স্থির, একাগ্র, অনাক্রমণ্য। আবার এর জন্য চৈত্যের পথও রয়েছে — তা হল যখন চৈত্যসত্তা তার সহজাত শক্তি নিয়ে বাইরে প্রকাশিত হয়, অর্থাৎ তার উৎসর্গ, আরাধনা, ভগবানের প্রতি ভালবাসা, আত্মদান ও সমর্পণের সঙ্গে, আর এ সমস্ত কিছুকে মন, প্রাণ ও শারীর চেতনার উপরে আরোপিত করে, সেইসঙ্গে তাদের সকল গতিবৃত্তিকে ভগবৎমুখী করে তুলবার জন্য বাধ্য করে তোলে। যদি চৈত্য শক্তিশালী হয়ে থাকে এবং আগাগোড়াই পথপ্রদর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে, সেক্ষেত্রে অন্তর্মুখী কষ্টভোগ বলতে কোন কিছুই

থাকে না অথবা খুব সামান্যই থাকে। আর বাহ্য কষ্টগুলি না অন্তরাত্মা নতুবা চেতনার অন্যান্য অংশ কোন কিছুকেই প্রভাবিত করতে সক্ষম হয় না। পথ থাকে সূর্যালোকিত, এক বিশাল আনন্দ এবং মধুরতাই হয়ে ওঠে সমগ্র সাধনার মূল সুর। বাহ্য আক্রমণ এবং বিরুদ্ধ পরিবেশের সম্বন্ধে এই বলা যায় যে, সেগুলি সত্তার সঙ্গে বাহ্যপ্রকৃতির সম্পর্ককে যে শক্তি রূপান্তরিত করে তোলে তার ক্রিয়ার উপরে নির্ভর করে। এই শক্তির বিজয়ের অগ্রগতি ঘটবার সাথে, বাধাবিঘ্নগুলি সব অপসৃত হয়ে যায়। কিন্তু প্রতিবন্ধকতাগুলি যত দীর্ঘদিন ধরেই স্থায়িত্ব লাভ করুক না কেন, সেগুলি সাধনাকে ব্যাহত করতে পারে না। কেননা তখন এমনকি বিরুদ্ধ বিষয় এবং ঘটনাবলীও তার অগ্রগতি লাভ করবার এবং চিৎপুরুষের বিকাশলাভের একটি মাধ্যম হয়ে ওঠে।

(ক্রমশ)

উৎস: *Letters on Yoga* (Imp 1988), Part Four, PP. 1615-1617,
অনুবাদ: দেবযানী সেনগুপ্ত

যখন তুমি শোন পাখির গান
তাকাও একটি সুন্দর ফুলের দিকে
চেয়ে দেখ ছোট্ট শিশুর মুখখানিকে
লক্ষ্য কর প্রত্যহের চলার পথে
কোন এক মহৎ ঔদার্যকে
পড়তে পড়তে যখন মিলে যায় একটি সুন্দর বাক্য
তাকাও অস্তায়মান সূর্যের দিকে
তা সে যে কোন জিনিসই হোক না কেন —
তখনই অকস্মাৎ এই জিনিস
তোমার কাছে এসে ধরা দেয়
হয়ত বা সে এক ধরনের ভাবাবেগ
যা সত্যসত্যই গভীর আর সুতীব্র
এ সমস্তই তো ভগবানেরই প্রকাশ ...
সমস্ত কিছুর অন্তরালে এমন কিছু রয়ে গেছে
যা ভগবান ছাড়া অন্য কিছু নয় ...

শ্রীমা

উৎস: Cent. Edi. Vol. No. 6, অনুবাদ: কানুপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়